ডিসেম্বর ২০১৭ □ অগ্রহায়ণ-পৌষ-১৪২৪

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা

জয় বাংলার জয়

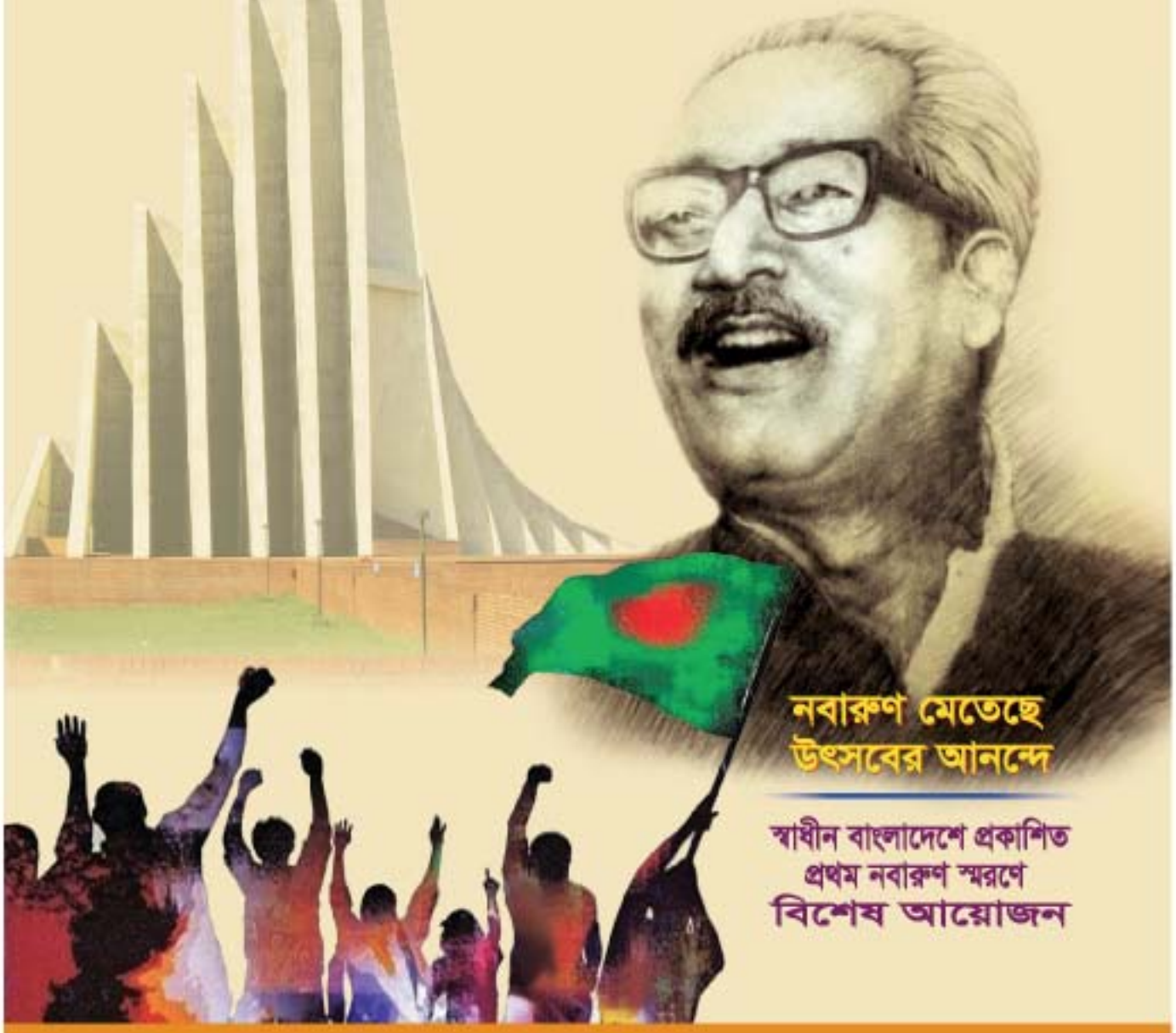

নবারুণ মেতেছে
উৎসবের আনন্দে

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশিত
প্রথম নবারুণ স্মরণে
বিশেষ আয়োজন

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়
লেখা পাঠাও গ্রাহক হও

নবারুণ-এর চাঁদা বার্ষিক ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করবেন। বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ডাকযোগে পাঠানো হয়।

- নবারুণ পত্রিকার সাথে যুক্ত হতে ফেইসবুকে লগ ইন করো Nobarun Potrika নামে। বন্ধু হও নবারুণ-এর।
আর হ্যাঁ, ই-মেইলে লেখা পাঠাতে চাইলে SutonnyMJ ফন্টে পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়: editornobarun@dfp.gov.bd

এজেন্টদের কপি ভি,পি, যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না।
এজেন্টদের কমিশন শতকরা ৩৩% হারে দেওয়া হয়।
এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বন্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ :dfpsb@yahoo.com • নবারুণ: editornobarun@dfp.gov.bd • বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

সৌজন্য সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০১৭ ■ অগ্রহায়ণ - পৌষ ১৪২৪

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা লাভ করা যেমন কঠিন স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কঠিন।'

খুব সত্যি কথা। লাখো মানুষের রক্তে পাওয়া এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে তৈরি হচ্ছে নবারুণ-এর বন্ধুরা। এসো, জাতির পিতার কথাতেই শপথ নেই–

'আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই টিকে থাকবে। বাঙালিকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই।'

বিজয় অর্জনের সেই শুভক্ষণ স্মরণে শুভেচ্ছা জানাই তোমাদের। কেউ যেন তোমাদেরকে দাবায়ে রাখতে না পারে, সেই শুভ কামনা রইল।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

শিল্প নির্দেশনা
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মন

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

ফটোগ্রাফার
মো. নাজিম উদ্দিন

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ :
সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

এ সংখ্যায় যা থাকছে

নিবন্ধ

০৪ জয় বাংলার জয়/রওশন আরা
০৬ নবারুণ মেতেছে উৎসবের আনন্দে/শাহানা আফরোজ
১০ তোমাদের চিঠি পেলাম/ সংকলিত
১১ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: ঐতিহাসিক স্বীকৃতি
২২ কারাগারের রোজনামচা'য় বঙ্গবন্ধু/অনুপম হায়াৎ
২৬ স্পুতনিকের কাহিনি/নাদিরা মজুমদার
৩৬ মহীরুহ/ হেনা নুরজাহান
৪৮ সাজিদ: এক স্বপ্নবাজ ক্রিকেটার/ মাসুমা রুমা
৫১ গারোদের অন্যতম উৎসব: 'রোংচুগালা/ মাহফুজ হিলালী
৫৩ তুষারের কান/ এম আতিকুল ইসলাম

কমিক্স

৪১ অবাক আঁকিবুকি/ কাজী তাবাসসুম আহমেদ

গল্প

১৯ এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা/মিয়াজান কবীর
৩০ চাঁদের চিঠি/ হেনা সুলতানা
৩৪ একদিন জন্মদিন/জোহরা শিউলী
৩৮ বন্ধু গাছ/ হাসান রাউফুন
৩৯ দোয়েলের পরীক্ষা ভীতি/ অনিক শুভ

ছড়া-কবিতা

১২ জন্মভূমি/ফজল-এ-খোদা
১৩ মুস্তাফা মাসুদ/নাসির আহমেদ/সাদিক আহম্মদ শান্ত
১৪ আ.শ.ম. বাবর আলী/বাপ্পি সাহা/আশরাফুজ্জামান/ জোবায়ের মিলন
১৫ দেলোয়ার হোসেন/সাঈদ তপু/লামিয়া হোসেন
১৬ নাসের মাহমুদ/এমরান চৌধুরী/প্রথমা চক্রবর্তী তিথি
১৭ জাহাঙ্গীর আলম জাহান/উম্মে মেহযাবিন মাঈশা
আহসান মালেক/লিয়ন আজাদ
৩৩ সৌর শাইন
৪৯ হাফিজ উদ্দীন আহমদ
৫৭ আরিফা আক্তার/ রাইসা ফারজানা/ সুমাইয়া আক্তার

ছোটোদের লেখা

১৮ পশুর মানবতা/ জুনায়েদ তৌহিদ
৪২ নীল তিতির/ কৃণন মাহমুদ নিয়োগী
৫০ খাগড়াছড়ি ও সাজেক ভ্রমণ/ সামিয়া হোসেন
৫৪ কর্ণফুলীর দিনরাত্রি/ মীম নোশিন নাওয়াল খান

আঁকা ছবি

১৩ স্বর্ণা রহমান
১৪ সংগ্রাম আহমেদ কবির
১৮ মুরসালিন রহমান অনিক
২০ নুরতাজ জাহান জুঁই
৫৭ মীর্জা মাহের আসেফ
৬০ আফরিন হোসেন অরন্যা
৬২ মরিয়াম চৌধুরী জয়িতা/ মুশফিকুর রহমান আবিদ
৬৩ অয়ালিদ হাসান/ স্পর্শ ডি কস্তা
৬৪ মো. তাহমিদুল হক তাসিন/ শেখ তাওসীফ বিন হাবিব

প্রতিবেদন

২৫ ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে 'গ্রন্থ ই-বুক' অ্যাপের উদ্বোধন/মেজবাউল হক
৫৬ শীতে গরম খাবার/ মো. জামাল উদ্দিন
৫৮ বেগম রোকেয়া ও সুলতানার স্বপ্ন/ জান্নাতে রোজী
৫৯ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৬১ আমের দেশে বইমেলা/ মো. আব্দুহু ছালেক বসুনীয়া
৬৫ শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ/ সুলতানা বেগম
৬৬ তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ/ সাদিয়া ইফফাত আঁখি

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় এল। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। আবার আলোর মুখ দেখল 'নবারুণ'। সেই আনন্দে পড় ৬-৮ পৃষ্ঠা

মতামত...

সাইয়্যিদ মঞ্জু : নবারুণ কীভাবে পাব

নবারুণ পত্রিকাটি সারা দেশে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অফিসগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। পাঠকের সুবিধার্থে দেশের সব তথ্য অফিসের সাথে যোগাযোগের ফোন নম্বর..... ৮-৯ পাতায় দেওয়া হল।

Namira Shuha : সবাই নিতে পারবে? প্লিজ

সবাই। কেন নয়?

Modasser Ali : চট্টগ্রামে তথ্য মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত শিশু কিশোর মাসিক নবারুণ অক্টোবর সংখ্যা থেকে প্রতিমাসে আমার কাছে পাবেন। যারা ফেসবুকে আমার সাথে যুক্ত আছেন ইনবক্সে নক করবেন। আর যারা নাই তারা ০১৮৭৯৫৭২৬৫২ এই নাম্বারে ম্যাসেজ রাখবেন। ঠিক সময়ে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ আপনাকেও। চট্টগ্রামে এখন নবারুণ চাইলেই পাওয়া যাবে, তাই না? এতো দারুণ খুশির খবর।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে এবং facebook.com/nobarunpotrikabd সাইটে পত্রিকাটি পড়া যাবে, মতামতও দেওয়া যাবে।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশিত
প্রথম নবারুণ স্মরণে
বিশেষ আয়োজন

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রকাশিত নবারুণের প্রচ্ছদ
শিল্পী ছিলেন হাশেম খান।

অঙ্গসজ্জায়

রফিকুন্নবী
আনিসুর রহমান
আবুল বারক আলভী
বরুণ মজুমদার

আমাদের কৌতূহল ছিল, নবারুণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা দেখার। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে নবারুণ-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। আষাঢ় ১৩৭৭। সেই হিসেবে সময়টা হয় জুন ১৯৭০। তখনো বাংলাদেশ নামক দেশটা বাঙালির বুকের ভেতর স্বপ্ন হয়ে আছে।

এরপর?

পাঠাগারেই পেলাম ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২-এ প্রথম প্রকাশিত নবারুণ। স্বাধীন বাংলাদেশে নবারুণ-এর প্রথম সংখ্যা। দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যেই স্বাধীনতার চেতনায় সদা স্বাধীন শিশু-কিশোরদের জাগিয়ে রাখার জন্য জেগে উঠল নবারুণ। সেই থেকে জেগে আছে আজ পর্যন্ত।

নবারুণ-এর সব অর্জনের ভাগিদার নবারুণ-এর লেখক-পাঠক- শুভানুধ্যায়ী সব্বাই।

জয় বাংলার জয়।

জয় নবারুণ-এর জয়।

আবার পড়ি
স্বাধীন দেশে
নবারুণ-এর
১ম সংখ্যা থেকে

জয় বাংলার জয়

রওশন আরা

চলো। এগিয়ে চলো। আজ ডাক এসেছে এগিয়ে চলার। চলো বীর নির্ভয়।

অরুণ প্রাতের তরুণদল এগিয়ে চলেছে। একুশের শপথ তাদের কণ্ঠে। রক্তে- রাঙানো রাজপথে আজো সে-স্মৃতি সোচ্চার। মায়ের মুখের ভাষায় মুখর হয়ে ওঠে সব মুখ। তারা বলে গেলো, বাংলা আমার আমি বাংলার।

সেদিন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। ইংরেজী ১৯৭০ সাল। তাজা-তরুণের মহামেলায় সে-কি উল্লাস। সে-কি হর্ষ। শেরে- বাংলার মাজার প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছে সারা দেশের তরুণদল। সগর্বে প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই দেশের নাম বাংলাদেশ।

আনন্দে আটখান হলো সব। আমার ভাষা বাংলা। আমার দেশ বাংলা। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

সে-কণ্ঠে ছড়িয়ে গেছে সবখানে। একুশে ফেব্রুয়ারী যে-মুকুল ফুটেছিলো তা ফুল হয়ে ফুটলো সেদিন।

উনিশ 'শ বায়ান্ন সালে যার শুরু হয়েছিলো তারই পরিপূর্ণতা হলো বুঝি। চির-তরুণের প্রতীক শেখ মজিবুর রহমান সেদিন সারা দেশের ছাত্রদের উদ্দেশে স্পষ্ট জানালেন এই দেশের নাম বাংলাদেশ।

তারপর কেটে গেছে কতো দিন। কতো রাত। কচি-কিশোরের কণ্ঠ ততোই সোচ্চার হয়ে উঠেছে জয় বাংলার জয়। তারা বীর দর্পে বলেছে, মা গো মা আমার, তোমার মুখের ভাষায় মর্যাদা আমরা দিয়েছি। তোমার পতাকা তুলে নিয়েছি এই আমাদের হাতে। মোদের গর্ব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা।

দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেলো। অনেক অনেক আঘাত আর অত্যাচারের মধ্যে কাটলো উনিশ 'শ সত্তর সাল। এলো ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উনিশ 'শ একাত্তর। সেদিনও প্রিয় নেতা অকুণ্ঠে জানালেন---রক্ত যখন দিয়েছি তখন আরো রক্ত দেবো। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

কলকণ্ঠে এগিয়ে চলেছে মিছিল—চলো। এগিয়ে চলো। আমরা বরকতের ভাই। আমরা সালামের ভাই। আমরা আসাদের ভাই। একুশের শপথ একসূত্রে গেঁথে দিয়েছি সবাইকে।

এই তো আমার সোনার দেশ। আমার জননী জন্মভূমি সোনার বাংলা। এক দিন যে মাটির বুক আলো করেছে দুরন্ত দামাল সূর্য সেন। যার মাটিতে পা পা হাঁটি হাঁটি করে এগিয়েছে দুর্জয় কিশোর বাঘা যতীন। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পায়ে পায়ে পথ চলেছে বিপ্লবী চারণ তিতুমীর। ফাঁসির মঞ্চে জীবন জাগার গান গেয়ে গেছে চির কিশোর ক্ষুদিরাম। জননী জন্মভূমির কোল ধন্য করে যেখানে জন্ম নিয়েছে বানীর দুলাল বিদ্রোহী নজরুল। যার মাথার উপর দুলছে রবি। বাংলা আর বাঙালির গর্বের বিশ্বকবি। সেই আলোর দিশারীই তো আমরা। আমাদের চলার পথে আজও তাদের অভয় বাণী শুনি।

চলো। এগিয়ে চলো। আগে, আরো আগে এগিয়ে চলো—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

সোনার বাংলার বুক বেয়ে তখন রক্ত ঝরছে। একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তে রাঙানো রাজপথ আবার লালে লাল হয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে গোটা দেশটাই হলো শহিদমিনার।

তবু তারা থামেনি। বাংলার বীর তরুণ দল থেমে নেই। ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারই প্রমাণ দিয়েছে তারা। জননী জন্মভূমির জন্যে অস্ত্র নিয়েছে হাতে। পশুশক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বাংলার কচি কিশোর তরুণ নিঃশেষে প্রাণ দান করেছে। আঘাতে অত্যাচারে জর্জরিত জননী-জন্মভূমির বুকে তবু আর্তি উঠেছে— ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।

বীরের শোক অশ্রু নয় অসির ঝংকার।

নির্ভয়ে এবার অস্ত্র তুলে নিলো বীর বাঙালী। অরুণ

প্রাতের তরুণ দল এগিয়ে এল মুক্তির গান গেয়ে। জন্ম নিল নতুন বাঙলার- নবমন্ত্রের উদ্গাতা মুক্তি-বাহিনী। মৃত্যু নয় মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া চাই— আমরা জয় করবো। জয়ী হবো।

সেই ২৫ শে মার্চ থেকে আমাদের যাত্রা শুরু। আমরা এগিয়ে চলেছি আগে আরো আগে। দেখতে দেখতে কেটে গেছে দুঃসহ দীর্ঘ নয় মাস। আমরা পার হয়ে এসেছি কত দুঃখের পারাবার। পিছনে পড়ে থাকল কত স্মৃতি। কতো সম্পদ। মাতার অশ্রুধারা, বীরের রক্তস্রোত ছড়িয়ে দিয়েছি পথে পথে। ঘরে ঘরে কান পেতে শুনেছি করুণ হাহাকার। গ্রামে-গ্রামে মৃত্যুর মহোৎসব। মায়ের-বোনের-ভায়ের রক্তে ভেসে গেছে সারা দেশ। নিঃশেষে ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছে জননী জন্মভূমির সম্মান-সম্ভ্রম। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে স্বাধীনতার সুখ। স্বাধীনতার স্বাদ। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, আমরা স্বাধীন। আমার বাংলাদেশ স্বাধীন।

সেই একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা হাঁটতে-হাঁটতে এসেছি একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর। স্বাধীনতার সূর্য উঠেছে স্বাধীন বাংলার আকাশে। নতুন দিনের আলোয় ভরে গেছে সারা দেশ। সেই আলোকে আমরা সৃষ্টি করেছি এক অনন্য ইতিহাস। আমরা বুকের রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর রেখে গেলাম আমার ভাষা বাংলা। আমার দেশ বাংলা।

এসো কিশোর। এসো তরুণ। এসো নব-নবীন। সাফল্যের জয়মাল্য তোমার গলায়। জয় বাংলার আবাহন তোমাদেরই কণ্ঠে সোচ্চার। এসো তরুণ প্রাতের তরুণ দল— তোমাদের পায়ে-পায়ে মুক্তির স্পন্দন। চলো এগিয়ে চলো—মুক্তকণ্ঠে গেয়ে যাই—জয় বাংলার জয়।

১৯৫২ থেকে ১৯৭২। বহ্নিমান বিশ বছর বুকে নিয়ে সোনার বাংলা আজ মুক্তধারায় হাসছে। সোনালী সূর্য উদ্ভাসিত হয়েছে স্বাধীনতার আকাশে। সেই একুশে ফেব্রুয়ারীর মুকুল ফুটেছে ১৬ ডিসেম্বর। আজ আমাদের আনন্দের দিন। আমাদের বিজয়ের দিন। আমরা মুক্তকণ্ঠে গেয়ে উঠি—জয় বাংলা জয়।

নবারুণ মেতেছে উৎসবের আনন্দে

শাহানা আফরোজ

আজ থেকে ৪৬ বছর আগে বিজয়ের আনন্দে মেতেছিল বাংলাদেশ। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর এসেছিল এ মহান বিজয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়োল্লাসের সাথে উদয় হয়েছিল আরেকটি নতুন সূর্যের। যার নাম নবারুণ। কলমকে অস্ত্র করে বিজয় পতাকা হাতে নিয়ে নতুন করে সেজেছিল শিশু-কিশোর পত্রিকা নবারুণ। সাহস, উদ্যম আর লেখনী শক্তিকে সাথি করে পাড়ি দিয়েছে অনেকটা পথ। সময় ও স্রোতকে যেমন ধরে রাখা যায় না তেমনি নবারুণও এগিয়ে গেছে সময়ের স্রোতে। তথ্য প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে নবারুণ এখন ডিজিটাল। সেই সাথে জয় করে নিয়েছে অগণিত পাঠকের মন। ইচ্ছে করলে যে কেউ যখন খুশি পড়তে পাড়ছে। বন্ধু হতে পারছে সহজেই। এখানেই বিজয়ের সার্থকতা। তাইতো প্রতি বছর বিজয় দিবসের সাথে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠে নবারুণ।

বন্ধুরা এবার জেনে নাও একটু পিছনের কথা। ১৯৭০ সালের জুন মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, আষাঢ়) প্রথম প্রকাশ হয় নবারুণ। তখন ছিল পাকিস্তান আমল। ২৭ পুরানা পল্টন পাকিস্তান পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত নবারুণ পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন আব্দুস সাত্তার। ১৯৭১-এর মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুন মাস পর্যন্ত প্রকাশ হয় পত্রিকাটি। তারপর বন্ধ হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার পথচলা শুরু করে। স্বাধীনতার পর ৯৬ পৃষ্ঠার প্রকাশিত প্রথম নবারুণের সম্পাদক ছিলেন কাজী আফসার উদদিন। প্রতিটি পাতা ছিল রঙিন, এখন নবারুণ আরো রঙিন। বঙ্গবন্ধুর বাণী, জাতীয় সংগীত, রণ সংগীত আর বাংলাদেশ নিয়ে লেখায় সমৃদ্ধ ছিল সংখ্যাটি। এরপর এগিয়ে যায় বাংলাদেশ, সাথে নবারুণ। মুক্ত পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে চলে।

সেই থেকে চলা নবারুণ আজো প্রকাশ হচ্ছে নতুনত্ব নিয়ে।চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত নবারুণে বিখ্যাত লেখকদের পাশাপাশি নতুন অনেক লেখকদের হাতেখড়ি হয় এ পত্রিকার মাধ্যমে। বড়োদের সাথে ছোটোদেরও সুযোগ দেয়া হচ্ছে সমান তালে। প্রতিটি সংখ্যায় থাকছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, ফিচার

কবিতা, নিয়মিত প্রতিবেদন, ছোটোদের লেখা ও আঁকাসহ অনেক মজার মজার বিষয়। কখনো প্রকাশ হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক বিশেষ সংখ্যা। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাগুলো হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শেখ রাসেল, ফুল ফল, পাখি, বাহন, ঘরবাড়ি, প্রজাপতি, ইত্যাদি। এছাড়া জাতীয় ও বিশেষ দিবসগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে বিশেষ লেখা। বন্ধুরা তোমরা যাতে সঠিক ইতিহাস জানতে পারো সেজন্য অনেক যাচাই বাছাই করে প্রত্যেকটি লেখা প্রকাশ করা হয়। এর সাথে থাকে চারুকলা ও নকশা বিভাগের বিশেষ যত্ন।

পৃথিবীর সবকিছু এখন হাতের মুঠোয়। নির্দিষ্ট কোনো কিছুতে আটকে থাকতে চায় না কেউ। নবারুণও এর ব্যতিক্রম নয়। লেখা প্রকাশের পাশাপাশি নবারুণ এখন তোমাদের জন্য আয়োজন করে আড্ডার, সম্মেলনের এবং মত বিনিময় সভার। বিভিন্ন মেলায়ও অংশগ্রহণ করে। এসো জেনে নেই সেসব কিছু খবর।

সাজ সাজ রবে ২০১৬ সালের ১৯ শে অক্টোবর নবারুণ প্রাঙ্গনে বসেছিল এক জমজমাট আড্ডা। অনেক বন্ধুরাই এসেছিল। হয়েছিল কলরব। নিজেকে বন্ধু ভেবে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুও যোগ দিয়েছিল এ আড্ডায়। গল্পের ছলে তোমাদের জন্য দিয়েছিল অনেক মূল্যবান উপদেশ। আড্ডা শেষে উপস্থিত বন্ধুরা উপহার পেয়েছিল গাছ। সেই সাথে নবারুণ বন্ধু

হাসানুল হক ইনু কথা দিয়েছিলেন আবার আসবেন।

আড্ডার রেশ কাটতে না কাটতেই ২০১৭ সালের ১৯ মে নবারুণ আয়োজন করে পরিবেশ সম্মেলনের। পরিবেশ সম্পর্কে তোমাদের সচেতন করতেই এই সম্মেলন। এখানেও যোগ দিয়েছিলেন নবারুণ বন্ধু তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। কথা দিয়ে কথা রেখেছেন তিনি। কুশল বিনিময়ের সাথে পরিবেশ সম্পর্কে তোমাদের সচেতন করে গেলেন। উদবোধন করলেন ছাদ বাগান।সেই সাথে বলে গেলেন বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে। কি বন্ধুরা গাছ লাগাচ্ছো তো।

পরামর্শ করে কাজ করলে সেই কাজ নাকি বেশি

ভালো হয়। এ নীতিবাক্য সামনে রেখে নরারুণ কিছু দিন পর পর আয়োজন করে মত বিনিময় সভার। বড়ো লেখকদের পাশাপাশি ছোট্ট বন্ধুদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয় সভায়। সবার সাথে মত বিনিময়ের পাশাপাশি পরামর্শও চাওয়া হয়। এরপর প্রতিটি পরামর্শ গ্রহণ করে বাস্তবে রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। শুধু তাই নয়, নবারুণ পরামর্শ নেয় বিদেশি অনেক বন্ধুদের কাছ থেকেও। এইতো কিছুদিন আগে নেপালের বিখ্যাত লেখক নবীন চিত্রকর এসেছিলেন নরারুণ অফিসে। ভালোবেসে শুভ কামনার সাথে দিয়েছে পরামর্শ। আর সাথে করে গিয়ে গেছে নবারুণ নেপালের বন্ধুদের জন্য।

বই সবচেয়ে ভালো বন্ধু। আর বইমেলা তো বই-এর আধার। বাংলাদেশে নানা উপলক্ষে বই মেলা হয়।এইসব বই মেলায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করে এবং স্টল দেয়। স্টলে অন্যান্য প্রকাশনার সাথে থাকে নবারুণও।একুশের বই মেলা, জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ার বইমেলা সব মেলাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে নবারুণকে। কিছুদিন পূর্বে রাজশাহীতে আয়োজন হয় বই মেলার সেখানেও অত্র অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করে। শুধু দেশে নয় দেশের

বাইরে কলকাতা বইমেলায়ও অংশগ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেছে নবারুণ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ । পিছিয়ে নেই নবারুণও ।এরই ধারাবাহিকতায় তোমরা লেখা পাঠাতে পারছো editornabarun@dfp.gov.bd এই ঠিকানায় । তবে লেখা হতে হবে sutonnyMG ফ্রন্টে, সাথে থাকতে হবে পূর্ণ ঠিকানা। nobarun potrica লিখে যুক্ত হতে পারো ফেসবুক পেইজে।আর সদস্য হতে চাইলে নির্দিষ্ট কুপন পূরণ করে ছয় মাস বা এক বছরের জন্য টাকা জমা দাও । পরবর্তী সংখ্যা পৌঁছে যাবে তোমার দেয়া ঠিকানায়। যদি কোনো তথ্য জানতে চাও তবে চলে আসো ১১২ সার্কিট হাউস রোডের অফিসে। অথবা ফোন করো ৯৫৫৭৪৯০ নম্বরে। প্রতি মাসে ১০০০০ সংখ্যা ছাপানো হয় নবারুণ। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হয় প্রতিটি জেলা তথ্য অফিসে। সংগ্রহ করে পড়তে পারো নবারুণ। ঠিকানাগুলো পাবে লেখার শেষে।

এবার তোমাদের একটি সুখবর দেই। বিজয় দিবসে নবারুণ মেতেছে নতুন উৎসবের আনন্দে। কারণ ডিসেম্বরে উদবোধন হলো নবারুণ অ্যাপস। এখন তোমরা ইচ্ছে করলেই Play store থেকে নবারুণ ডাউনলোড করতে পারবে। পড়তে পারবে যখন তখন পুরো পত্রিকা। কি খুশি তো তোমরা।

তোমাদের জন্য নবারুণ। লেখা পাঠাও সমৃদ্ধ কর নবারুণকে। আনকোরা হাতকে শক্তিশালী করাই আমাদের লক্ষ্য। হোক না নবারুণ তোমার হাতেখড়ির খাতা। নবারুণের হাত ধরে অনেক ছোট্ট বন্ধুই তো লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একুশে বই মেলায় প্রকাশ করছে বই।অনেকে আবার বিভিন্ন পুরস্কারও পাচ্ছে। এর গর্বিত অংশীদার আমরাও।

এগিয়ে গেছে দেশ , এগিয়ে যাও তোমরা । বিজয়ের মাসে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠো সবাই। সবাইকে লাল-সবুজ বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

নবারুণ পত্রিকাটি সারা দেশে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অফিসগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। পাঠকের সুবিধার্থে দেশের সব তথ্য অফিসের সাথে যোগাযোগের ফোন নম্বর দেওয়া হলো:

০১. জেলা তথ্য অফিস, ঢাকা ০২-৭১১৬৮২৩ ০১৭১৫-৮১৪৩১১

০২. জেলা তথ্য অফিস, নারায়ণগঞ্জ ০২-৭৬৩০৪৮৩ ০১৭১৭-০৫৯৩৭২

০৩. জেলা তথ্য অফিস, মানিকগঞ্জ ০২-৭৭১০৩৭৯

০৪. জেলা তথ্য অফিস, গাজীপুর ০২-৯২৬১৭৮৭ ০১৭৭১-৩২৭৬৪৪

০৫. জেলা তথ্য অফিস, নরসিংদী ০২-৯৪৬২২০৬ ০১৮১৯-২৯৪০০৫

০৬. জেলা তথ্য অফিস, মুন্সীগঞ্জ ০২৭৬১১১১১, ৭৬১০০০৩, ০১৮১৮-৩৯৯৬৭৭

০৭. জেলা তথ্য অফিস, টাঙ্গাইল ০৯২১-৬৩৪২৬, ৫১৫৫৫, ০১৭১৭-১৫৮৩০৬

০৮. জেলা তথ্য অফিস, ফরিদপুর ০৬৩১-৬২৭৫৫ ০১৭১৮-৮৪৯৬৭৪

০৯. জেলা তথ্য অফিস, রাজবাড়ি ০৬৪১-৬৫৪১৫

১০. জেলা তথ্য অফিস, গোপালগঞ্জ ০৬৬৮৫৫৫৪৩

১১. জেলা তথ্য অফিস, মাদারীপুর ০৬৬১-৬১৫৮৩ ০৬৬১-৬১৭৫৮

১২. জেলা তথ্য অফিস, শরীয়তপুর ০৬০১-৫৫৬৩১ ০১৮১২-২২২৪৮৯

১৩. জেলা তথ্য অফিস, কিশোরগঞ্জ ০৯৪১-৬১৮৭৮ ০১৭১৮-১৮৭০১৬

১৪. জেলা তথ্য অফিস, শেরপুর ০৯৩১-৬১৫১২ ০১৭১২-৭১৫৩৬৭

১৫. জেলা তথ্য অফিস, জামালপুর ০৯৮১-৬৩৪৭৪, ০১৭১৮-৬৮৫৯৬৬

১৬. জেলা তথ্য অফিস, নেত্রকোণা ০৯৫১-৬১৫০১ ০১৭১৮-৮১৭৩৮২

১৭. জেলা তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ ০৯১-৬৪৩১৭ ০১৭১৫-৩৭৪৬৬১

১৮. জেলা তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম ০৩১-৬১১০৭৯ ০১৭১২-৭৫৯৯০৫

১৯. জেলা তথ্য অফিস, কক্সবাজার ০৩৪১৬৩২৬৬, ০১৮১৮-৬৪৯৮৬৬

২০. জেলা তথ্য অফিস, রাঙামাটি ০৩৫১-৬২৩২৮ ০১৫৫৬-৬১৩১১৪
২১. জেলা তথ্য অফিস, নোয়াখালী ০৩২১-৬১৪৯১ ০১৫৫-৮৫৭০০৩৭
২২. জেলা তথ্য অফিস, বান্দরবান ০৩৬১-৬২৫৮২
২৩. জেলা তথ্য অফিস, খাগড়াছড়ি ০৩৭১-৬১৮২১
২৪. জেলা তথ্য অফিস, চাঁদপুর ০৮৪১-৬৩৮১৯ ০১৯১৯-৪৫১৬৯৭
২৫. জেলা তথ্য অফিস, কুমিল্লা ০৮১-৬৯৪১৪ ০১৭১৫-৬১৬৯১৮
২৬. জেলা তথ্য অফিস, ফেনী ০৩৩১-৭৩৪৭০
২৭. জেলা তথ্য অফিস, লক্ষীপুর ০৩৮১-৬১৩৮৭ ০১৭১৬-৫৯৩৮৬৯
২৮. জেলা তথ্য অফিস, ব্রাহ্মনবাড়িয়া ০৮৫১-৫৮৪৩৯, ০১৬৭৯-১৭০০০৪
২৯. জেলা তথ্য অফিস, সিলেট ০৮২১-৭১৬২২৬ ০১৭১১-০৪০৩০৩
৩০. জেলা তথ্য অফিস, সুনামগঞ্জ ০৮৭১-৫৫৪৪৫
৩১. জেলা তথ্য অফিস, হবিগঞ্জ ০৮৩১-৫২৫৬২
৩২. জেলা তথ্য অফিস, মৌলভীবাজার ০৮৬১৫২৩৭৯
৩৩. জেলা তথ্য অফিস, বরিশাল ০৪৩১-৬৪৭৬৮ ০১৭১৪-৫৯২৫০৫
৩৪. জেলা তথ্য অফিস, পিরোজপুর ০৪৬১৬২৪১৯
৩৫. জেলা তথ্য অফিস, ঝালকাঠি ০৪৯৮-৬৩৩৭৭
৩৬. জেলা তথ্য অফিস, ভোলা ০৪৯১-৬১৪৩১
৩৭. জেলা তথ্য অফিস, পটুয়াখালি ০৪৪১-৬২৪৬০ ০১৭১৫-৬১৩৮৬৪
৩৮. জেলা তথ্য অফিস, বরগুনা ০৪৪৮-৬২৫৮০ ০১৭১২-৯৬৬৪৫৫
৩৯. জেলা তথ্য অফিস, রংপুর ০৫২১-৬৩২৯২ ০১৭১২-৭৩২৩৮৯
৪০. জেলা তথ্য অফিস, গাইবান্ধা ০৫৪১-৬১৫৮১ ০১৭১২-১২৬৪১৯
৪১. জেলা তথ্য অফিস, নীলফামারী ০৫৫১-৬১৩৯৪
৪২. জেলা তথ্য অফিস, লালমনিরহাট ০৫৯১-৬১৪৬৬, ০১৯১১-০২৪২৮৩
৪৩. জেলা তথ্য অফিস, পঞ্চগড় ০৫৬৮-৬১৩৮৩
৪৪. জেলা তথ্য অফিস, কুড়িগ্রাম ০৫৮১-৬১৪০১ ০১৭১৬-৪৯১২৫৩
৪৫. জেলা তথ্য অফিস, ঠাকুরগাঁও ০৫৬১-৫২৬৭০
৪৬. জেলা তথ্য অফিস, দিনাজপুর ০৫৩১-৬৫০৩৯ ০১৭১৪-৬০২৯৮৯
৪৭. জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী ০৭২১-৭৬০০৮৯
৪৮. জেলা তথ্য অফিস, নাটোর ০৭৭১-৬৬৭৫৬ ০১৯১২-২১৮৮৭৪
৪৯. জেলা তথ্য অফিস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ০৭৮১৫৫৩২০
৫০. জেলা তথ্য অফিস, নওগাঁও ০৭৪১-৫২২০৭
৫১. জেলা তথ্য অফিস, সিরাজগঞ্জ ০৭৫১-৬২১৯৬
৫২. জেলা তথ্য অফিস, বগুড়া ০৫১-৬৫৩১৭ ০১৭১৬-২২৩৩৮৭
৫৩. জেলা তথ্য অফিস, পাবনা ০৭৩১-৬৬২৪১
৫৪. জেলা তথ্য অফিস, জয়পুরহাট ০৫৭১-৬২২৫৭ ০১৭১৮-৭৮৭৪৬১
৫৫. জেলা তথ্য অফিস, খুলনা ০৪১-৭২১৮৪২ ০১১৯৯-৩৯৬৫৫৬
৫৬. জেলা তথ্য অফিস, সাতক্ষীরা ০৪৭১-৬৩৫১১
৫৭. জেলা তথ্য অফিস, বাগেরহাট ০৪৬৮-৬২৫৭২ ০১৯১১৮৭৮৫০২
৫৮. জেলা তথ্য অফিস, যশোর ০৪২১-৬৩৬৪৭
৫৯. জেলা তথ্য অফিস, মাগুড়া ০৪৮৮-৬২৪৫০ ০১৯১৫৪৮৪৫৬৬
৬০. জেলা তথ্য অফিস, নড়াইল ০৪৮১-৬২৪১৮ ০১৭২৪-৯৪৯৫৩৪
৬১. জেলা তথ্য অফিস, ঝিনাইদহ ০৪৫১-৬২৫২৪ ০১৭১৬-০১৭৮০৫
৬২. জেলা তথ্য অফিস, কুষ্টিয়া ০৭১-৭১১৫৮, ৭৩২৫৩, ০১৫৫৮৩৬২০৫৮
৬৩. জেলা তথ্য অফিস, চুয়াডাঙা ০৭৬১-৬৩১৪১
৬৪. জেলা তথ্য অফিস, মেহেরপুর ০৭৯১-৬২৪৩৭
৬৫. তথ্য অফিস, লামা ০৩৬২৬-৩২ ০১৮৫৩১৩৭৯৪৭
৬৬. তথ্য অফিস, রামগড় ০৩৭২৭-৪৬ ০১৮১৯-০৯৯৪৪২
৬৭. তথ্য অফিস, পটিয়া ০৩০৩৫-৫৬৩৫১ ০১৭১১-৯৭৪৩৭৩
৬৮. তথ্য অফিস, কাপ্তাই ০৩৫২৯-৫৬৩৭৫ ০১৮১৮২৩৮৬২৭

আবার পড়ি
নবারুণ-এর
১ম সংখ্যা থেকে

তোমাদের চিঠি পেলাম

তোমাদের প্রিয় পত্রিকা 'নবারুণ' প্রকাশিত হলো। নিশ্চয় খুশী হয়েছো তোমরা। তোমাদের মনের মতো করে 'নবারুণ' কে এবার যেমন খুশী সাজাও। সব পেয়েছির স্বাধীনতার আনন্দ আজ সবার মনে-প্রাণে। তোমাদের শিল্পে-সাহিত্যে, কাজে-কথায়, চিন্তায় চরিত্রে তার-ই বিকাশ ঘটুক। জীবনের আলো আশার প্রতিফলন হোক। মনে রাখতে হবে আজ তোমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক।

তোমরা ভালো করেই জানো যে, এই স্বাধীনতার জন্য অনেক মূল্য দিয়ে তবেই আমরা স্বাধীন হয়েছি। লাখো শহীদের বুকের রক্তে লেখা আজকের স্বাধীনতা। সেই আলোকে তোমরা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠো। স্বাধীনতা সংগ্রামের যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই শুরু হলো তোমাদের অভিযান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যেমন ডাক দিয়েছেন—এবারের সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম।

তাই নতুন করে এবার দেশকে গড়ে তোলার সংকল্পে ব্রতী হও। স্বাধীনতার আকাশে আলো ঝালোমলো 'নবারুণ' উঠেছে--- চোখ মেলে চাও। সে আলো সে আভা ছড়িয়ে যাক্ সবখানে।

হ্যাঁ, এরপর থেকে 'নবারুণ' প্রতিমাসে নবরূপে প্রকাশিত হবে। তোমাদের হাতে নিয়মিতভাবে পাবে নতুন দিনের 'নবারুণ'। সেই সঙ্গে চিঠিপত্রের এই আসরটিও থাকবে। তোমরা অবশ্যই তোমাদের কথা লিখবে। অজানাকে জানার তোমাদের যে অদম্য কৌতূহল তার-ই যেনো প্রতিফলন ঘটে তোমাদের চিঠি-পত্রে। তা ছাড়া এমন ধরনের প্রশ্ন করবে যার উত্তর পেয়ে শুধু একজন নয়, আসরের অগণিত ভাই-বোনই খুশী হবে ও নতুন করে কিছু শিখতে পারবে।

আজকের এই আনন্দের দিনটিতে তোমরা সবাই প্রাণ-ঢালা প্রীতি ও শুভেচ্ছা নাও। আজকের এই বিজয়ের দিনটি থেকেই শুরু হোক তোমাদের জীবন-জয়ের অভিযান। নব কলেবরে নবারুণ তোমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। হ্যাঁ, ইতোমধ্যে তোমাদের যে সব চিঠি পেয়েছি তার জবাব দিচ্ছি—

মনজুর আলম, খিলগাঁও, ঢাকা

❑ বিজয়দিবসে 'নবারুণ' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। সত্যিই খুশীর খবর। স্বাধীনতার স্বাদ আমরা সাহিত্যে-শিল্পে সবকিছুতেই পেতে চাই। সেই তো আমাদের সবপেয়েছির সুখ।

❑ ষোলই ডিসেম্বরে নতুন কলেবরে 'নবারুণ' বের হলো। এই দিনটিই তো আমদের বিজয়ের দিন। যেদিন সর্বপ্রথম স্বাধীনতার সূর্য উঠলো আমাদের আকাশে। ঠিকই বলেছো আমাদের কাজে- কথায় -স্বপ্নে- সাধনায় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই স্বাধীন সত্তার প্রতিফলন ঘটবে সন্দেহ নেই।

লুবনা ও আতিয়া, নড়াইল, যশোহর

❑ আমাদের মত মেয়েদের লেখা 'নবারুণে' ছাপাবেন তো? আমাদের কাছে অনেকগুলো ধাঁধা আছে। অনুমতি দিলে পাঠাইতে পারি। কবি নজরুল ইসলামের কয় ছেলে-মেয়ে? তাদের নাম কি?

❑ তোমাদের মত কিশোর-কিশোরীদের জন্যই তো এই পত্রিকা। তোমাদের লেখা প্রকাশ করার উপযুক্ত হলে অবশ্যই ছাপবো। তোমাদের ধাঁধাগুলো পাঠাও। ভালো হলে ধাঁধার আসরে প্রকাশ করা হবে। তবে ধাঁধাগুলো ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংগে উত্তর পাঠাতে ভুলো না। বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুটি পুত্র। কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম। কবির প্রথম পুত্র ছোট বেলায় মারা যায়। কবির কোন মেয়ে নেই।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ
ঐতিহাসিক স্বীকৃতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। সোমবার (৩০ অক্টোবর ২০১৭) প্যারিসে ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ে এ ঘোষণা দেন মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 'মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার' -এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এটি ইউনেস্কো দ্বারা পরিচালিত বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্র ঐতিহ্যের একটি তালিকা। আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্ব রয়েছে এমন বিষয়গুলোকেই এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতির ফলে সারা বিশ্ব এখন আরো বিশদভাবে বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী।

'মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ বিশ্বের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয় তালিকাভুক্তির জন্য সুপারিশ করে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি (আইএসি)। গত ২৪-২৭ অক্টোবর আইএসি কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে 'মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ তালিকাভুক্তির বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আন্তর্জাতিক দলিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ঐতিহ্যের সংখ্যা হলো এখন ৪২৭টি।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বিদেশি বন্ধু ফাদার মারিনো রিগন চিরদিনের জন্য চলে গেলেন। একাধারে দার্শনিক লেখক, অনুবাদক, মানবসেবক ও সমাজসেবক। তবে বাংলাদেশের জন্য তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, তিনি ছিলেন বাঙালি, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের পরমাত্মীয়। সেই আত্মার টানে লিখেছেন : মাথায় লালন, হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ।

ইতালির ভিচেঞ্জা প্রদেশে ভিল্লাভেরলা গ্রামে ১৯২৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম। ১৯৫৩ সালের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে তাঁর প্রথম আগমন। কর্মসূত্রে দেশের নানা অঞ্চল ঘুরে অবশেষে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন সুন্দরবনের কাছে মংলার শেলাবুনিয়া গ্রামে। তাই তিনি বলেছিলেন: 'সুন্দরবনের শেলাবুনিয়ায় আমাকে কবর দিতে হবে, অন্য কোথাও না'!

আবার পড়ি
স্বাধীন দেশে
নবারুণ-এর
১ম সংখ্যা থেকে

জন্মভূমি

ফজল-এ-খোদা

মাগো আমার মা- জননী
স্নেহময়ী জন্মভূমি–
কত আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে
লালন করো তুমি।
তোমার সুখে আমি সুখী
তোমার দুখে আমি দুখী
তোমার স্তন্য দিয়ে ধন্য করে
ঠাঁই দিয়েছ তুমি,
মাগো আমার মা- জননী
স্নেহময়ী জন্মভূমি।
জন্মভূমি মাগো আমার
তোমার কোলে এসে–
গর্বে আমি বিশ্ব ভুলি
তোমায় ভালোবেসে।
দিবস রাতি আশা করি
তোমার বুকেই যেন মরি
আমি নিত্য বাঁচি নতুন করে
তোমার মাটি চুমি
মাগো আমার মা- জননী
স্নেহময়ী জন্মভূমি।

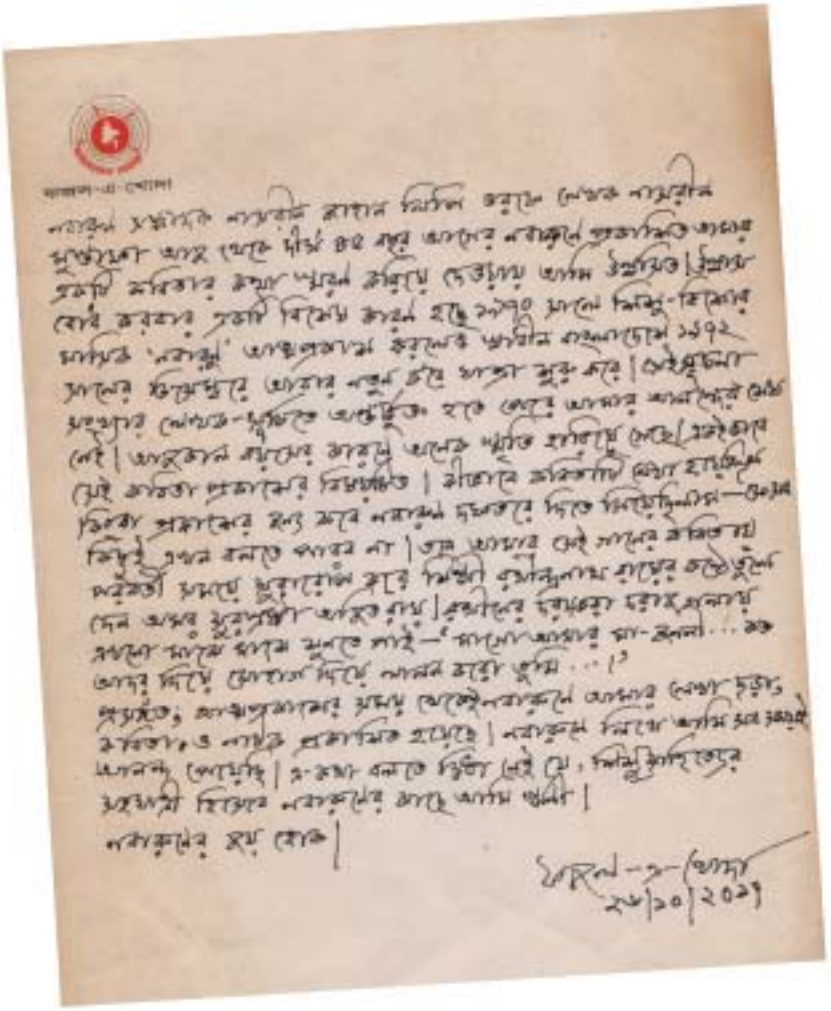

ফজল-এ-খোদা

জন্ম ২৫ ফাল্গুন ১৩৪৮ (৯ মার্চ ১৯৪১), পাবনার বেড়া থানার বনগ্রামে। কবি, গীতিকার, শিশুসাহিত্যিক ও শিশু সংগঠক। সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার। শিশু সংগঠন শাপলা শালুক আসর-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মিতাভাই নামে খ্যাত।

সরকারি চাকরি ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ তাঁর অহংকার। তেমনি ১৯৭৫-এর ৩ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। বেতার মুখপত্র বেতার বাংলা-র প্রথম সম্পাদক। অন্য দুটি সহযোগী ইংরেজি মাসিক *BANGLADESH BETAR* এবং শিশু-কিশোর মাসিক *শাপলা শালুক* তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তাঁর লেখা গান 'সালাম সালাম হাজার সালাম' আজো আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। ১৯৭১-এ অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে টেলিভিশন থেকে প্রচারিত 'সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম চলবে দিনরাত অবিরাম' গানটি প্রচারের ধরন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি* বইতে। স্বাধীনতার পর 'যে দেশেতে শাপলা শালুক ঝিলের জলে ভাসে' গানটিও অসম্ভব জনপ্রিয় হয়।

কাকে বলি বিজয় দিবস

মুস্তাফা মাসুদ

কাকে আমরা বিজয় দিবস বলি?
কোন্ গরবের সঙ্গী হয়ে
আমরা সবাই সূর্য রথে চলি?

বিজয় দিবস– সে তো এক মহাকাব্য,
রক্তের নদী পাড়ি দিয়ে এসে
আজো তার কথা ভাবব।
মনের তুলিতে এখনো সে ছবি আঁকছি,
কত না যতনে এই বুকে ধরে রাখছি!
সেই ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস,
সাহসে দীপ্ত খুশির জয়োল্লাস!

তিরিশ লক্ষ তাজা প্রাণ দান
কত না কষ্ট ক্লেশ,
নয়টি মাসের সেই মহারণ
এক দিন হলো শেষ;
স্বাধীন সূর্য স্বাধীন আকাশে হাসে,
চারদিকে শুধু বিজয়ের ধ্বনি ভাসে।
কোটি বাঙালির সারা মন জুড়ে
স্বাধীন মাটির মায়া,
মায়ের মতোই বিছিয়ে রেখেছে
অপরূপ স্নেহ-ছায়া।

সেই ছায়া-মায়া কখনো হবে না শেষ,
বুকের মাঝেই রাখব বাংলাদেশ।
এ মাটি আমার মায়ের মতোই প্রিয়,
চিরকাল ধরে থাকবেই বরণীয়।

স্বাধীনতা পতাকায়

নাসির আহমেদ

আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় স্বাধীনতা
পতাকায় ইতিহাস, আছে নীরবতা।
লাখো শহিদের তাজা রক্তের দাগ
পতাকার সূর্যেই সেই অনুরাগ।

সূর্যটা রক্তের রঙে আঁকা লাল
শহিদের স্মৃতি বেঁচে থাক চিরকাল।

সবুজ শ্যামল প্রিয় স্বদেশের মুখ
সে সবুজ পতাকায় বাংলার বুক।
সবুজে শোভিত প্রিয় আমার এ দেশ
গৌরব গাথা এর হবে না তো শেষ।

লাখো শহিদের কাছে আমাদের ঋণ
স্বদেশকে ভালোবেসে যাব চিরদিন।

স্বাধীনতা

সাদিক আহম্মদ শান্ত

পেলাম দেশের স্বাধীনতা
পতাকা যাঁর জন্য
যাঁর কারণে বিশ্বে আমরা
হলাম সবাই ধন্য।

অনেক অনেক শ্রদ্ধা জানাই
মহান নেতার প্রতি
জনগণের সেবায় যিনি
ছিলেন মহান ব্রতী।

১০ম শ্রেণি, হোমল্যান্ড আইডিয়াল স্কুল
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

বিজয়ের পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দামাল ছেলেরা
এই ছবিটি এঁকেছে- স্বর্ণা রহমান, ১০ম শ্রেণি
ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ঢাকা

একাত্তরের নয়টি মাসে

আ. শ. ম. বাবর আলী

একাত্তরের নয়টি মাসে
রক্তঝরা চেষ্টাতে,
বীর বাঙালি অস্ত্র ধরে
করলো স্বাধীন দেশটা যে।

মা হারালো সন্তান তার
বোন হারালো ভাইটাকে,
হারিয়ে স্বজন বন্ধু সুজন
এমনি ভাবে পাই তাকে।

লাখ শহিদের রক্ত মেখে
স্বাধীনতার সূর্যটা,
আসলো যে এই সোনার দেশে
ছড়িয়ে দিয়ে তার ছটা।

আজকে স্বাধীন তুমি আমি
কওতো সে কার শ্রেষ্ঠ দান?
স্বাধীনতার অগ্নিপুরুষ
শেখ মুজিবুর রহমান।

ছবিটি এঁকেছে বিশেষ বন্ধু
সগ্রাম আহমেদ কবির

বঙ্গবন্ধু

আশরাফুজ্জামান বাবু

আমরা বলি বঙ্গবন্ধু
'বুকের ধন' কন মা'য়,
এমন নেতা একটি দেশে
একটি বার-ই জন্মায়।

এখনও 'মুজিব'

জোবায়ের মিলন

এখনও 'মুজিব' একটি স্লোগান
একটি প্রেরণার নাম
এখনও 'মুজিব' কোটি জনতা
অযুত নিযুত দাম।

এখনও 'মুজিব' আকাশে বাতাসে
ধ্বনি তোলে সারাবেলা
এখনও 'মুজিব' গান গেয়ে যায়
যেখানে জীবন মেলা।

এখনও 'মুজিব' মিছিল মশাল
অগ্রভাগের শিখা
এখনও 'মুজিব' মা ও মাটি
প্রাণে প্রাণে লিখা।

এখনও 'মুজিব' এখনও 'মুজিব'
এখনও 'মুজিব' তাই
'মুজিব' -এর নামে রক্তের মাঝে
বিপ্লবী সুর পাই।

চেতনার সেই মণি

বাপ্পি সাহা

যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস আজ বাঙালির জয়
রক্তে রক্তে জয় বাংলাতে নেই পরাজয় ক্ষয়।
আমি তুমি এক এই বাংলা নেই বাংলাতে ভয়
সব কিছু আজ এক বৃত্তে মুক্তিতে ভুলময়।
মৃত্তিকা আজ রেখে যায় ঘ্রাণ জুড়িয়ে আমার প্রাণ
চারদিকে আজ শুধু তাই নয় কিছু ম্রিয়মান।
ইতিহাসে শুধু দেখি আমি আজ মুজিবের কালধ্বনি
আসবে কি ফিরে আর কখনো চেতনার সেই মণি।

আজ বিজয়ের দিন

দেলোয়ার হোসেন

শহর নগর গ্রাম গঞ্জে নামলো খুশির ঢল
বিজয় দিনের আনন্দে আজ সূর্য ঝলমল।
আকাশ জুড়ে উড়ছে পাখি গাইছে মধুর গান,
যুদ্ধ জয়ে উথাল পাথাল বাঙালিদের প্রাণ।
চতুর্দিকে বিজয় মিছিল স্বপ্নভরা মন,
পশ্চিমারা হার মেনেছে শেষ হয়েছে বন।
আমরা এখন স্বাধীন জাতি গর্বে উঁচু শির,
বিশ্ববাসী জানলো এবার বাঙালিরা বীর।
আজও মনে পড়ে আমার বঙ্গবন্ধুর ডাক,
কোথায় আমার বাঙালি ভাই জাগরে তোরা জাগ।
শুরু হলো যুদ্ধ যখন সবার কঠিন মন,
পড়লো মনে বঙ্গবন্ধুর দীপ্ত সেই ভাষণ।
গ্রাম পুড়ালো পশ্চিমারা মারলো লক্ষ লোক,
মায়ের বুকে আজও বাজে স্বজন হারা শোক।
লাল সবুজের পতাকাটা স্বাধীনতার চিন,
বছর ঘুরে ফিরে আসে সেই বিজয়ের দিন।

বিজয়

লামিয়া হোসেন

নয় মাস যুদ্ধ করে
পেলাম এক স্বাধীন দেশ
সে যে আমার সোনার বাংলা
আমার প্রিয় বাংলাদেশ।

যাদের আত্মত্যাগে
সারা বিশ্বে বাংলাদেশের নাম
বিজয় মাসে জানাই তাদের
শ্রদ্ধা ও সালাম।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

মানস পটে আঁকা

সাঈদ তপু

মানস পটে একটি আঁকা ছবি
সেই ছবিটা আমরা সবাই চিনি
কাব্য ছড়া না লিখেও যিনি
হলেন দেশের মস্ত বড়ো কবি।

কেউ বা তাকে বলেন চিত্রকর
আঁকাজোকা ছিল না তার পেশা
রাজনীতিটা শুধুই ছিল নেশা
একটি ছবি আঁকেন জীবনভর।

সেই ছবিটা রং তুলিতে নয়
মমতা আর ভালোবাসায় আঁকা
চির সবুজ বেষ্টনীতে ঢাকা
ছবিটা তার ভীষণ আবেগময়।

এই ছবিটার নাম বাংলাদেশ
এই ছবিটা শেখ মুজিবের আঁকা
এই কবিতা শেখ মুজিবের লেখা
এর ভেতরে আমরা আছি বেশ।

তাই তো খুকি পাখা মেলে
নীল আকাশে হাওয়ার বুকে
শ্বেত পায়রার সঙ্গী হয়ে
উড়ে বেড়ায় পরম সুখে।

পায়রা– খুকি বন্ধু হলো
মিষ্টি রোদের আলো মেখে
দিনের শেষে ফিরল ওরা
স্বাধীনতার স্বাদটি চেখে।

জাতির পিতা

নাসের মাহমুদ

আমার বুকে বিল ও বাঁওড়
বন বনানি - গাছ,
ঝরনা জলের বর্ষাধারা -
উজানভাটির মাছ।

আমার বুকে দেশের মাটি
আকাশ ঘুমোয় রোজ,
এই মাটিতে, ঐ আকাশে
পাই যে মনের খোঁজ।

আমার বুকে নদী থাকে
আমার বুকে পাখি,
তিরিশ লক্ষ শহিদ আমি
আমার বুকে রাখি।

আমার বুকে ফুল পাপড়ি
ফল ও ফুলের ঘ্রাণ,
আমার বুকে জাতির পিতা
শেখ মুজিবের প্রাণ।

শেখ মুজিব

প্রথমা চক্রবর্ত্তী তিথি

যাঁর প্রেরণায় বাঙালিরা
মুক্তিযুদ্ধে যায়
যাঁর কারণে বীর বাঙালি
শক্তি, সাহস পায়।

যাঁর কারণে স্বাধীন হলো
বাংলাদেশের ভূমি
তিনি হলেন শেখ মুজিবুর
দু'চরণ যাঁর চুমি।

৫ম শ্রেণি, চন্দ্রনাথ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

মুজিবকে তুমি যে নামে ডাকো

এমরান চৌধুরী

মুজিবকে তুমি যে নামে ডাকো সে নামে দেবে সাড়া
সারাটা জীবন তাড়া ছিল বেশ আর নেই কোনো তাড়া।
তোমাদের আছে পড়ালেখা আর ডিজিটাল মাতামাতি
আছে মামা বাড়ি, কোচিং ক্লাশ রকম রকম সাথি।

এক প্রহরও নেই অবসর করো কাজে দিন পার
কখনো কখনো এদিক ওদিক ছুটে চলো বার বার।
মুজিব এখন কান পেতে রাখে কখন ডাকবে তোমরা?
কখন ডাকবে প্রিয় নাম ধরে ডাকবে পরান ভোমরা।

খোকা বলে ডাকো, ডাকো মিয়াভাই কিংবা মুজিব নামে
ডাকো মধুমতি, বাইগার নদ খুঁজে পাবে ডানে বামে।
ডাকো মুজিবুর, শেখ মুজিবুর রহমান বলে ডাকো
যার যেমনটি খুশি লাগে মনে বুকের ভেতরে রাখো।

ডাকো প্রাণ দিয়ে বঙ্গবন্ধু অপার খুশির নাম
জাতির পিতা, যে নামেই ডাকো সাড়া দেবে অবিরাম।
ডাকো স্বাধীনতার মহান কবি ডাকো অবিনাশী স্বর
ডাকো জনতার মুখের আদল চেতনার বাতিঘর।

ডাকো বাঙালি প্রাণ খুলে সবে সর্বকালের সেরা
ডাকো উন্নত মম শির যাঁর বিজয়ীর বেশে ফেরা।
এ বদ্বীপের আনাচে কানাচে যেখানে বাড়াবে হাত
পাবে নিশ্চিত মুজিবের ছোঁয়া হোক যতো গাঢ় রাত।

মুজিব এখন বাংলার বুক থাকে তোমাদের বুকে
হাত বাড়ালেই পাবে তাঁর দেখা নাও ঘ্রাণ সুখে দুখে।

যুদ্ধ করে

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

স্বাধীনতা রক্তে পাওয়া
মর্যাদা ও মান
পৃথিবীতে একটি জাতির
গর্বিত উত্থান।

স্বাধীনতা তিরিশ লাখের
আত্মদানের গাথা
বিশ্বসভায় বীর বাঙালির
উন্নত শির-মাথা।

স্বাধীনতা মায়ের কথা
বাবার বজ্রমুঠি
লাল টুকটুক রক্ত বরণ
গোলাপ ফুটি-ফুটি।

স্বাধীনতা সব দীনতা
মোচন করার নাম
যুদ্ধ করে মায়ের সুনাম
মর্যাদা রাখলাম

সোনার বাংলা

উম্মে মেহযারিন মাঈশা

ঘাতক যারা বঙ্গবন্ধুর
তাদের এবার ধরবো
দেশে এনে নীতির সাথে
বিচার তাদের করবো।

আমরা যারা শিশু কিশোর
লেখাপড়া করবো
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ
সোনার বাংলা গড়বো।

৭ম শ্রেণি, নবীগঞ্জ জে.কে মডেল হাই স্কুল,
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

পায়রা ও খুকি

আহসান মালেক

জানালা ধরে একটি খুকি
দিচ্ছে উঁকি দূর আকাশে
দেখল সে এক শ্বেত পায়রা
পাখা মেলে হাওয়ায় ভাসে।

এদিক ওড়ে ওদিক ওড়ে
উড়ছে পুরো আকাশ জুড়ে
উড়তে উড়তে হাওয়ার ছোঁয়ায়
গান গেয়ে যায় সুরে সুরে।

খুকির তখন ইচ্ছে করে
উড়বে সেও পায়রা হয়ে
থাকবে না আর একলা পড়ে
চার দেয়ালের এই নিলয়ে।

মায়ের মুখে শুনছিল

লিয়ন আজাদ

একাত্তরে তোর বাবাও দেশের তরে লড়ছিল
অনাহারে কত যে দিন কাটছিল তার কাটছিল

প্রাণের মায়া ছেড়ে তখন জয়ের নেশায় ছুটছিল
উদম গায়ে নয় মাস ধরে রোদ বৃষ্টিতে পুড়ছিল

দিনের পরে দিন পেরিয়ে এমনিতে তার কাটছিল
নীরব থেকে মানবতা শুধুই তখন দেখছিল

নয় মাসে এই দেশের বুকে অনেক কিছু ঘটছিল
অন্য দেশের মানুষ তখন নীরব হয়ে দেখছিল

এমনি করে দেশ থেকে যে অজস্র প্রাণ ঝরছিল
নয়মাস শেষে বাঙালিরা বিজয় নিয়ে ফিরছিল

দশম শ্রেণি, শিমুলিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মুরসালিন রহমান অনিক, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, খলিলুর রহমান স্কুল, মুন্সীগঞ্জ

পশুর মানবতা

জুনায়েদ তৌহিদ

জানি না সেই ছেলেটি এখন কেমন আছে। সেই ভয়াবহ মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে পড়লে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ১৯৭১ সাল দেশে যুদ্ধ বেঁধে গেছে। পাক হানাদার বাহিনী দেশের নিরীহ মানুষের উপর নির্বিচারে হত্যা, অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করেছে। জীবন ও অত্যাচারের ভয়ে দলে দলে মানুষ দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাচ্ছে। কি মুসলিম, কি হিন্দু-শিশু, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ কেউই হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। ভারতে যাবার জন্য বিভিন্ন এলাকার লোকজন আমাদের বাথান গাছি গ্রামের রাস্তা ব্যবহার করত। রাত হয়ে গেলে অনেক শরণার্থী গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান করত। এমনই একদিনের কথা বলছি।

একদিন একজন গর্ভবতী নারী বিদ্যালয়ে রাত্রে অবস্থান করেন। সেই নারী নিজের ও আগত সন্তানের জীবন বাঁচাতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে বিদ্যালয়ের এককোণে ভোর রাতে সন্তান জন্ম দেন।এর কিছু সময় পরে খবর আসে পাঞ্জাবিরা (হানাদার বাহিনী) আসছে। এই খবর পাওয়া মাত্র সবাই যে যে-দিকে পারল জীবন নিয়ে ছুটে পালালো। সবে মাত্র জন্ম নেওয়া বাচ্চা ফেলে সেই মা জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে চলে গেল। পাক হানাদার বাহিনী তাদের অত্যাচার, নির্যাতন শেষ করে চলে যাবার পরের দিন লোকজন দেখতে পেল ৩/৪ টি কুকুর ছোট্ট বাচ্চাটিকে পাহারা দিচ্ছে এবং বাচ্চাটি তখনো নড়াচড়া করছে। লোকজন বাচ্চাটির বাবা-মাকে খুঁজে না পেয়ে এলাকার রহিমের মা বলে পরিচিত এক মহিলার নিকট বাচ্চাটির লালন পালনের দায়িত্ব দেন। রহিমের মার নিজের সংসার চলে না, অন্যের বাড়িতে কাজ করে তারপরেও সে এই অসহায় বাচ্চার দায়িত্ব নেয়। এর কয়েকদিন পরে বাচ্চার বাড়ির লোকজন খোঁজ করে বাচ্চাটিকে নিয়ে যায় । কিন্তু কোথায় গেল? বাঁচল না মরল তার কোনো খবর আমরা জানি না। এই ভাবে কত মানুষ যে মা-বাবা হারা, বাড়ি হারা, সংসার হারা হয়েছে তার কোনো শেষ নেই।

মুক্তিযুদ্ধের কথা আমার দাদির কাছে জানতে চাইলে তিনি এইভাবে বর্ণনা করলেন এবং তিনিও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। সবাই আমার দাদি'র জন্য দোয়া করবেন।

তৃতীয় শ্রেণি, এস এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ধল্লার রণাঙ্গনে

এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা

মিয়াজান কবীর

১৯৭১ সাল। সারাদেশ অসহযোগ আন্দোলনে উত্তাল। মিছিল আর মিছিল। ২৩ মার্চের সকালে ছাত্রনেতা ফারুক ইকবাল মিছিলের অগ্রভাগ থেকে এগিয়ে চলেছেন রামপুরার দিকে। স্বৈরাচারী শাসকের নির্দেশে গুলি চালায় মিছিলের উপর। গুলিতে শহিদ হোন মালিবাগের ফারুক ইকবাল। ঢাকার রাজপথ হয় রক্তাক্ত। আমি তখন চৌদ্দ-পনেরো বছরের এক কিশোর বালক। অজপাড়া গাঁ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছি কবিতার ভাষায়। শুধু কবিতার ভাষায় প্রতিবাদ করে ক্ষান্ত হইনি। মানিকগঞ্জে সিংগাইর উপজেলায় ইরতা গ্রামে ঐতিহাসিক পানগড়ভিটার মাঠে নিয়েছি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ।

আমার প্রপিতামহ মোহাম্মদ জমিরউদ্দিন মোল্লা ছিলেন নীলবিদ্রোহী। পিতামহ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা ছিলেন দুঃসাহসিক নাবিক। পিতা মোহাম্মদ আনসার উদ্দিন মোল্লা ছিলেন প্রদীপ্ত এক সংগ্রামী মানুষ। অগ্রজ মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন খোকা ও নাসির উদ্দিন রশিদ ছিলেন চর আগ্রাসীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক দক্ষ তীরন্দাজ। পূর্ব পুরুষের রক্তধারা আমার শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত। উনসত্তরে গণআন্দোলনে মিছিলের অগ্রভাগে থেকে 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত করে তুলেছি আকাশ-বাতাস।

একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইট নামে ২৫ মার্চ ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালায়। নৃশংসভাবে হত্যা করে নিরপরাধ মানুষকে। এই হত্যাকাণ্ড আমার কিশোর মনে দাগ কাটে। ছেলেবেলায় চর দখলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে প্রতিবাদী ছিলাম। তেমনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবাদে লিখেছি কবিতা। মুক্তিসেনাদের বীরদর্পে এগিয়ে চলতে কবিতার ভাষায় জানিয়েছি আহবান:

'তোমার আমার ঠিকানা,
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' স্লোগানে স্লোগানে
প্রকম্পিত করে তুলেছি
আকাশ-বাতাস।

সারাদেশের পরিস্থিতি কিছুদিনের মধ্যে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। শুধু কবিতার ভাষায় বীরত্ব বন্দনায়-বঞ্চনার জ্বালা দূরীভূত হওয়ার নয়। তাই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উদ্দাম মনে ছুটে চললাম। মায়ের সোহাগ, বাবার স্নেহ, ভাইয়ের আদর, বোনের মমতা, বন্ধুর ভালোবাসা সবকিছু উপেক্ষা করে স্বাধীনতার ডাকে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। স্বাধীনতা মানে বীরদর্পে পথ চলা। স্বাধীনতার মহান মায়ায় দেশের মানুষের পাশে এসে কাঁধে কাঁধ রেখে দাঁড়ালাম। লেফট-রাইট, বাম-ডান তালে তালে তাল মিলিয়ে বাঁশের লাঠি কাঁধে তুলে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিলাম। 'নিজে বাঁচো, শত্রুকে মারো' এই রণকৌশলের দিক নির্দেশনা দেওয়া হলো।

যুদ্ধ মানেই হত্যা-ধ্বংস-বীভৎসতা। যুদ্ধ বাঁধলে কতদিনে শেষ হবে তা কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ভিয়েতনামে দীর্ঘদিনের যুদ্ধের কথা ভেবে সবাই শঙ্কিত। বাংলাদেশেও যদি ভিয়েতনামের মতো যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে রণাঙ্গনে অনেক যোদ্ধা মারা যাবে। তরুণ বৃদ্ধ হবে। আবার শিশু-কিশোর তারুণ্যের দ্বার প্রান্তে এসে অস্ত্র হাতে করবে মরা বাঁচার লড়াই। এসব কথা ভেবে মনের মাঝে বিদ্রোহের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। ভোরের আলোর প্রত্যাশায় প্রতিদিন সূর্যস্নান প্রভাতে প্রশিক্ষণ চলতে থাকে।

ভয় করি না মেশিনগান
দেশের জন্য দেবো প্রাণ।
সবার হাতে জয় নিশান
গাইবো মোরা মুক্তির গান।

১৬ ডিসেম্বর। তিমির রাতের বাধা অতিক্রম করে আলোর হাতছানিতে এগিয়ে চলেছি। এমন সময় লোকমুখে তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে খানসেনা আমাদের ইরতা গ্রামে ঢুকে পড়েছে। আমি এ সংবাদ পেয়ে আমাদের গ্রামের বাজারের দিকে ছুটে চললাম।

বাজারের কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেলাম ৩০-৩৫ জন খানসেনা বাজারে ঢুকে পড়েছে। খানসেনাদের চোখে-মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পিছু ছুটছে। নয়ত আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে ঢাকা অভিমুখে। যুদ্ধবাজদের যুদ্ধ করার মতো কারো মনোবৃত্তি নেই। সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত-রণক্লান্ত।

ধলেশ্বরী নদীর খেয়াঘাটের দিকে খানসেনারা পথ চলতে থাকে। আমি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খানসেনাদের খবর পৌঁছে দিতে পিছু ছুটলাম। ইতোমধ্যে কিছু সংখ্যক খানসেনা ধলেশ্বরী নদী পাড় হয়ে গোলড়া গ্রামের কাছাকাছি চলে যায়। বাকি সৈন্যদের খেয়া নৌকায় নদীর মাঝামাঝি দেখেই আত্মসমর্পণের জন্য উচ্চকণ্ঠে আহবান জানাতে থাকি- 'হাতিয়ার ছোড় দো, হাতিয়ার ডাল দো'। আমার উচ্চকিত কণ্ঠ যেন নদীর জল তরঙ্গে বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে ছাপিয়ে উঠে: 'হাতিয়ার ছোড় দো, হাতিয়ার ডাল দো'।

পলায়নপর খানসেনারা আমার উত্তেজিত কণ্ঠে আত্মসমর্পণের আহবান শুনে ভীত চোখে বার বার তাকাতে থাকে। জীবন বিপন্ন হওয়ার ভয়ে কোনো প্রতিকার কিংবা প্রতিবাদ করার মতো তাদের মনোবল ছিল না। এত ভীত শঙ্কিত ছিল যে সেদিন একটি গুলি ছুঁড়তেও সাহস পায়নি। কেননা, গুলির শব্দ শুনে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীকে ঘিরে ফেলতে পারে, এই ভয়ে ছিল কম্পমান।

খানসেনাদের কথা এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিশোধ নেবার দৃঢ় শপথে হেমায়েতপুর-সিংগাইর রাস্তার পাশে ওৎপেতে বসে থাকে। জায়গীর গ্রামের সংলগ্ন ব্রিজের আড়াল থেকে মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে। ফলে একজন খানসেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। খানসেনারা হিংস্রতায় রাস্তার দুপাশের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলে। শুধু তাই নয় গ্রামের নিরীহ জনসাধারণের উপর চালায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

মুক্তিযোদ্ধারাও এই হত্যাকাণ্ডে প্রতিশোধের আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। গুলির বিকট শব্দে পাখিরা বাসা ছেড়ে চলে যায় নির্জন নির্বাসনে। বউ-ঝিরা দৌড়ে আশ্রয় নেয় বন-জঙ্গলে। গ্রামের মানুষ বসত-বাড়ি ছেড়ে পালাও পালাও আত্মচিৎকারে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। স্বদেশের বুকেও আশ্রয় নিয়ে রেহাই পায়নি কোলের শিশু সোনাবান, বাউল বয়াতি আবুল বাশার। রেহায় পায়নি এমনি আরো

নূরতাজ জাহান জুঁই, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, এস. ডি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ

অনেক শিশু-কিশোর, তরুণ-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নিরপরাধ মানুষ।

নরম মাটির বুকে পড়ে থাকে রক্তাক্ত লাশ। ধলেশ্বরীর বুকে জেগে ওঠা চরে পরে থাকে টগবগে তরুণ মুক্তিযোদ্ধা আনিস, রমিজ, শরীফ। রক্তে রঞ্জিত হয় ধলেশ্বরী-গাজিখালী-বংশী নদীর জলরাশি। বালিয়াড়ি মাটি সিক্ত হয় দেশ প্রেমিকের তাজা রক্তে।

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। যে মাটির জবর দখলের বিরুদ্ধে লড়েছেন আমার সংগ্রামী পিতা-প্রপিতামহ। সেই মাটি আর মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ধল্লার রণাঙ্গনে শত্রুর সঙ্গে লড়ছি সম্মুখ সমরে। গেরিলা কায়দায় হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলতে চলতে শুঁকে নেই সোদা মাটির গন্ধ।

নরম মাটিতে বুক লাগিয়ে অনুভবে অভিভূত হই মাটির মমতা জড়ানো পরশে। অজানা অশুভ সংকেত বারবার দোলা দিয়ে যায় মনের গহীনে। যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুর একটি গুলি বক্ষ ভেদ করে চিরতরে নিভিয়ে দিতে পারে আমার কিশোর দীপশিখা খানি।

রণাঙ্গনে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখতে পাই আগুনের জ্বলন্ত শিখা, ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশ, শুনতে পাই গুলির দ্রিম দ্রিম শব্দ। বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে পোড়া বারুদের গন্ধ। গ্রাম জনপদ হয় ভস্মীভূত। পরিণত হয় বিরানভূমি।

মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে আমি এক কিশোর বালক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একাত্ম হয়ে প্রতিশোধ-প্রতিরোধে এগুতে থাকি কঠিন শপথে ধল্লার রণাঙ্গনে। বাংলার দামাল ছেলেদের কাছে গেরিলা যুদ্ধে টিকতে না পেরে খানসেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। ধলেশ্বরী নদীর পূর্বপাড়ে মুক্তিযোদ্ধা আর মিত্রবাহিনী সম্মিলিতভাবে পথ প্রতিরোধ করে তোলে। নিরুপায় হয়ে খানসেনারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। শত্রুসেনাদের হাতে পড়ে বন্দির শিকল।

স্বাধীনতার উষালগ্নে রক্তের সিঁড়ি বেয়ে অজানা পথে চলে গেল বীর সৈনিকেরা। দেশের জন্য উৎসর্গ করে গেল অমূল্য জীবনখানি। তারা আর কোনো দিন ফিরে আসবে না এই ধূলার ধরায়। বুকের তাজা রক্তের আলপনায় এঁকে দিয়ে গেল সবুজ জমিনে লাল সূর্য।

স্বাধীনতার অমিয় সুরে দোয়েল-শ্যামা, বুলবুলি শিস দিয়ে গেয়ে যায় গান। গায় বীরের বন্দনাগীতি। মুক্তির গান-সে গান অনির্বাণ।

কিশোর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও গবেষক

ভুল করো না নিজের ভাষায়

অশুদ্ধ/বর্জনীয়	শুদ্ধ
উদযাপন	উদ্‌যাপন
উদঘাটন	উদ্‌ঘাটন
এগার	এগারো
বার	বারো
তের	তেরো
আঠার	আঠারো
আটাশ	আঠাশ
চুড়ান্ত	চূড়ান্ত
জন্যে	জন্য
প্রেরন	প্রেরণ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
পরবর্তীতে	পরবর্তী সময়ে
আগামীতে	ভবিষ্যতে
আর্জি	আরজি
এক তৃতীয়াংশ	এক-তৃতীয়াংশ
প্রনয়ন	প্রণয়ন

নবারুণ স্কুল প্রতিনিধি

মারিয়া হায়দার ঋতু
৪র্থ শ্রেণি
পিএন গার্লস স্কুল, রাজশাহী।

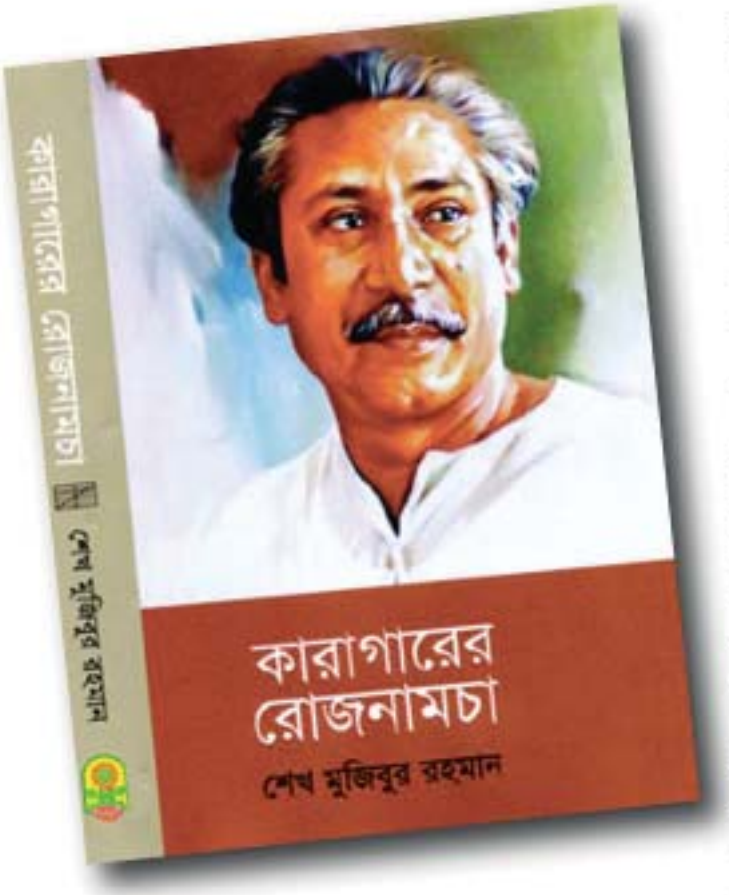

'কারাগারের রোজনামচা'য় বঙ্গবন্ধু

'বই আর কাগজই আমার বন্ধু'

অনুপম হায়াৎ

বাংলা একাডেমি থেকে ২০১৭ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর *কারাগারের রোজনামচা* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তাঁর বই ও সংবাদপত্র পড়ার উল্লেখ রয়েছে। বলা যায়, জেল জীবনে, কারাদণ্ডপ্রাপ্ত জীবনে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক থাকার সময়ে বই এবং সংবাদপত্র ছিল বঙ্গবন্ধুর নিত্যসঙ্গী। নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনে তিনি বই এবং সংবাদপত্র পাঠ করে জ্ঞানার্জন করতেন, দেশ-বিদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতেন। সংবাদপত্র পাঠ করে তিনি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করতেন।

বঙ্গবন্ধু ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলখানায় ১৯৬৬ সালের ২ জুন থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ও ১৯৬৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২২ জুন পর্যন্ত এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অন্তরিণ থাকা অবস্থায় ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি থেকে (কিছু সময়ের মধ্যে) *রোজনামচা* লিখেছেন।

কারাগারে থাকার সময় তিনি *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক সংবাদ*, *পাকিস্তান অবজারভার*, *মর্নিং নিউজ*, দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকা পড়তেন। আর বিভিন্ন বই সম্পর্কেও তাঁর *রোজনামচায়* উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯৬৬ সালের ৪ জুন বঙ্গবন্ধু *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *দৈনিক আজাদ* পড়ে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। ঐদিন তিনি একটি বইও পড়েছেন বলে *রোজনামচায়* লিখেছেন :

> 'বন্ধু শহীদুল্লাহ কায়সারের *সংশপ্তক* বইটি পড়তে শুরু করেছি। লাগছে ভালোই, বাইরে পড়তে সময় পাই নাই।' (পৃষ্ঠা ৬৩)

উল্লেখ, শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) ছিলেন সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও ঔপন্যাসিক। তাঁর *সারেং বউ* ও *সংশপ্তক* উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের বড়ো ভাই।

১৯৬৬ সালের ১৮ জুন 'কারাগারের রোজনামচা'য় তিনি আরেকটি বই পড়ার কথা লিখেছেন-

> 'ঘরে বসে বই পড়তে আরম্ভ করলাম। এমিল জোলা-র লেখা 'তেরেসা রেকুইন' পড়ছিলাম। সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনটি চরিত্র-জোলো তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে। এই বইয়ের ভিতর কাটাইয়া দিলাম দুই-তিন ঘণ্টা সময়।' (পৃষ্ঠা ১০১)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এমিল জোলা ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য সমালোচক। তাঁর জন্ম ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি 'তেরেসা রেকুইন' উপন্যাসটি ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

হয় না' 'মর্নিং নিউজ'র হেডলাইনগুলি দেখলেই বুঝতে পারি কি লিখতে চায়- 'আজাদ' আওয়ামী লীগের কিছু সংবাদ দেয়। 'সংবাদ' তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেগুলি দরকার তাই ছাপায়। 'অবজারভার' বোধ হয় একটু ভয় পেয়েছে। (পৃষ্ঠা ১০৩)

'বই আর কাগজই আমার বন্ধু। এর মধ্যেই আমি নিজেকে ডুবাইয়া রাখি।'

বঙ্গবন্ধুর ঐ দিনের লিখিত রোজনামচা থেকে আরো জানা যায় যে, ঐ তারিখ-

> 'প্রায় তিনটায় সময় কাগজগুলি কয়েদি পাহারা দিয়ে নিয়ে এল। পাকিস্তান দেশরক্ষা আইন বলে 'নিউ নেশন প্রেস' বাজেয়াপ্ত করিয়াছে সরকার। এই প্রেস হইতে *ইত্তেফাক*, ইংরেজি সাপ্তাহিক *ঢাকা টাইমস* ও বাংলা চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক *পূর্বানী* প্রকাশিত হইত। পুলিশ প্রেসে তালা লাগাইয়া দিয়েছে। ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে' (পৃষ্ঠা ১০২)

'ইত্তেফাক' ছাড়া অন্যান্য পত্রিকা সম্পর্কে জানা যায় তাঁর *রোজনামচা* থেকে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

> 'এখন আর কাগজ পড়তে বেশি সময় আমার দরকার

১৯৬৬ সালের ২৫ জুন এবং ২৭ জুনের 'রোজনামচা'য়ও বই পড়ার প্রসঙ্গ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ২৭ জুন পড়া বইটি ছিল 'একটা গল্পের বই'। (পৃষ্ঠা ১২২, ১২৩ ও ১৩০)

৩০ জুনের *রোজনামচা'য়* লিখেছেন,

> 'ভালো বইপত্র দিবে না, রিডার্স ডাইজেস্ট পর্যন্ত দেয় না। মনমতো কোনো বই পড়তেও দিবে না।' (পৃষ্ঠা ১৩৭)

এই লেখা থেকে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধুর বই পড়ার আকুল স্পৃহা এবং পাকিস্তানি শাসকদের মনোভাব।

২ জুলাই ১৯৬৬ সালের *রোজনামচায়* বঙ্গবন্ধু ভারতে মুসলমানদের বিভিন্ন ন্যায্য দাবিদাওয়া প্রসঙ্গে ১৯২১, ১৯২৪, ১৯২৮, ১৯৩০-৩১, ১৯৩৭ ও ১৯৪০ সালের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা 'উদ্ধৃতি'সহ উল্লেখ করেছেন। এতে তাঁর বিভিন্ন ঐতিহাসিক বইপত্র পাঠের পরিচয় মেলে (পৃষ্ঠা

১৩৯-১৪২)।

৩ জুলাই, ১৯৬৬ তারিখের '*রোজনামচা'য়* বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

> 'আজ আর খবরের কাগজ আসবে না। মিলাদুন্নবীর জন্য বন্ধ। দিন কাটানো খুব কষ্টকর হবে। আমিতো একাকী আছি, বই আর কাগজই আমার বন্ধু। এর মধ্যেই আমি নিজেকে ডুবাইয়া রাখি। পুরানা ইত্তেফাক কাগজ বের করে পড়তে শুরু করলাম'। (পৃ:১৪৩)

১৯৬৬ সালের ২৪ জুলাই '*কারাগারের রোজনামচা'য়* বঙ্গবন্ধু লিখেছেন গভীর বেদনার কথা–

> 'বারবার আমার আব্বা ও আম্মা'র কথা মনে পড়তে থাকে। মায়ের সাথে কি আবার দেখা হবে। অনেকক্ষণ খবরের কাগজ ও বই নিয়ে থাকলাম। কিন্তু মন থেকে কিছুতেই মুছতে পারি না, ভালও লাগছে না।' (পৃষ্ঠা ১৭৯)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নূরে আলম সিদ্দিকী 'রক্তকপোত' নামে একটি বই লেখার জন্যে মামলার আসামী হয়েছেন সে তথ্যটিও পাওয়া যায় ১৯৬৭ সালের ১৬-২২ এপ্রিল তারিখে লিখিত বঙ্গবন্ধুর '*কারগারের রোজনামচা'য়*। (পৃষ্ঠা২২৫)

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে ঢাকা সেনানিবাসে নেয়া হয়। ওই সময় বঙ্গবন্ধু 'বই খাতা' রেখে যেতে বাধ্য হন। সামরিক সেনাদের কঠোর প্রহরায় নির্জন কুঠুরিতে বন্দি থাকা মৃত্যুর প্রহর গণনা অবস্থায়ও বঙ্গবন্ধু যেমন দেশ ও জনগণের কথা ভোলেননি তেমন বই এবং সংবাদপত্রের কথাও ভোলেননি। তিনি লিখেছেন–

> 'কিছুই জানি না, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, সময় কাটবে কি করে? বইপত্র নাই, খবরের কাগজ দেওয়া হবে না।'(পৃষ্ঠা ২৫৭)

'*কারাগারের রোজনামচা'য়* অন্যত্র তিনি লিখেছেন–

> 'আমার কাছে দুইখানা মাত্র বই ছিল। অন্য বইগুলো জেলখানায় রেখে এসেছি। ভুল করেছি বই না এনে। অফিসার ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, বই পড়তে আপত্তি আছে কি-না। তিনি বললেন, বই দেওয়ার হুকুম আপাতত পাই নাই। তবে আপনার কাছে থাকলে পড়তে পারেন। .....সুকর্ণর পতন সম্বন্ধে বই দু'টি পড়তে লাগলাম। কিন্তু মন বসছে না, নানা চিন্তা ঘিরে ধরছে'। (পৃষ্ঠা ২৫৮)

দুটি বই পড়ার পর বঙ্গবন্ধু সামরিক কর্মকর্তা ব্রগেডিয়ার আকবরকে বই সরবরাহ ও বই পড়ার অনুমতি দানের অনুরোধ করেন। এই প্রেক্ষাপটে লে. ওয়ারিদ ও ডিউটি অফিসার মেজর নাঈম বঙ্গবন্ধুকে বই এনে দেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

> 'আমি বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু পারতাম না। অনেকগুলি পাতা পড়ে ফেলেছি। কিন্তু যা পড়েছি মনে নাই। আবার নতুন করে পড়তে হয়েছে।' (পৃষ্ঠা ২৬১-২৬২)

তিনি মৃত্যুর প্রহর গোনা অবস্থায় সংবাদপত্র পাঠ করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে গ্রেফতারকৃত ২৮ জনের নাম জানতে পারেন। ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি লিখেছেন–

> 'দিনগুলি কি কাটতে চায়। তবুও কাটাতে হবে। বই পেয়ে একটু রক্ষা পেয়েছিলাম।' (পৃষ্ঠা ২৬৪)

'*কারাগারের রোজনামচা*' থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় যে, ওই সময় সেনানিবাসের অফিসার মেসে, লাইব্রেরিতে কোনো বাংলা বই ছিল না। হেড কোয়ার্টার লাইব্রেরিতেও বাংলা বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতা ছিল। তিনি লিখেছেন–

> '... অফিসার মেসের যে ছোট লাইব্রেরি আছে তাতে কোনো বাংলা বই নাই, সমস্ত বই ইংরেজি ও উর্দুতে। .... হেড কোয়ার্টার লাইব্রেরিতে ..... কোনো বাংলা বই বোধ হয় সেখানে নাই।' (পৃষ্ঠা ২৬৭)

৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে 'গ্রন্থ ই-বুক' অ্যাপের উদ্‌বোধন

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই জানো বঙ্গবন্ধুর দেয়া ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা। ৪৬ বছর আগে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) স্বাধীনতাকামী সাত কোটি মানুষকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি নিধনে নামলে বঙ্গবন্ধুর ডাকে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। নয় মাসের সেই সশস্ত্র সংগ্রামের পর আসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১৩ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্‌বোধন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ওপর একটি বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ, সেটির ই-বুক ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকের শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ থেকে নির্বাচিত ২৬টি বাক্যের ওপর 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য' শিরোনামে গ্রন্থের তিন ধরনের সংস্করণের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়াও বিশ্লেষণধর্মী এ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি যথাযথভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য' গ্রন্থটির পরিকল্পনাকারী এবং প্রধান উপদেষ্টা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এর প্রচ্ছদ এঁকেছেন চিত্রশিল্পী হাশেম খান।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে বাছাই করা ২৬টি বাক্যের বিশ্লেষণ করেছেন মুস্তফা নূরউল ইসলাম, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, এসএ মালেক, সেলিনা হোসেন সহ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও লেখক।

গ্রন্থটির ইলেকট্রনিক ভার্সন অর্থাৎ ই-বুক গুগল প্লে-স্টোর ও অ্যাপল স্টোরে বিদ্যমান sheiBoi শীর্ষক অ্যাপের মাধ্যমে পাঠ করা যাবে। এছাড়া ৭ March Speech Analysis নামে গুগল প্লে-স্টোর থেকে গ্রন্থটি ডাউনলোড করা যাবে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

মহাশূন্য যুগের প্রথম প্রভাত
স্পুতনিকের কাহিনি

নাদিরা মজুমদার

বুধবার, অক্টোবর মাসের চার তারিখ, সাল ২০১৭। এইদিন স্পুতনিক-১-এর ষাট বছর পূর্তি হলো। দেখতে অতি সাদামাটা স্পুতনিক-১-এর বড়ো অহংকার যে - সে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। সেই গত শতাব্দীতে, ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসের চার তারিখে পৃথিবীর চারদিকে বার কয়েক ঘুরে সে মহাশূন্য-যুগের সূচনা করে। ইতিহাসে 'মহাশূন্য-যুগ' নামে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়, যার অপ্রতিহত গতিবেগ অব্যাহত রয়েছে। এই যুগটি মহাজগতকে, যাকে আমরা বলি 'পর্যবেক্ষণীয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড', তাকে হৃদয়ঙ্গম করার দরজাটি খুলে দেয়। মহাশূন্য-অভিযানের শুরু হয়।

আমরা হয়ত অনায়াসে বলতে পারি যে মানব-সভ্যতা যতদিন টিকে থাকবে মহাশূন্য-অভিযানের ব্যাপ্তি ও পরিধিও ততদিন টিকে থাকবে। হবে প্রায় অন্তহীন যুগ। সারা পৃথিবীতে স্পুতনিক-১-এর গোলাকার ষাটতম পূর্তি ঘটা করে পালিত হয়। এই স্পুতনিক-১-এর জন্ম-ইতিহাস আসলে সোভিয়েত রকেট বিজ্ঞানী সের্গেই পাভলোভিচ করোলিয়েভের এবং মার্কিন-জার্মান মিসাইল ইঞ্জিনিয়ার ভার্নার ফন ব্রাউনের মধ্যকার যুগগত তীব্র প্রতিযোগিতার ফল।

রকেট-প্রতিভা সের্গেই করোলিয়েভ

ফল স্বরূপ, অবশেষে ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসের চার তারিখে, বাইকোনুর কসমোড্রোম থেকে স্পুতনিক কে উৎক্ষেপণ করা হয়; রুশ ভাষায় স্পুতনিকের অর্থ উপগ্রহ। বাইকোনুর কসমোড্রোমটি কাযাখস্তানের স্তেপ অঞ্চলে অবস্থিত এবং স্পুতনিককে ঠেলে উপরে উৎক্ষেপণ কর্মে ব্যবহার হয় আর-৭ সেমেরকা নামক পৃথিবীর প্রথম অন্তর্মহাদেশীয় দূরবেধী ক্ষেপণাস্ত্র বা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল।

করোলিয়েভ বনাম ফন ব্রাউন প্রতিযোগিতা

১৯৫৪ সালের শেষের দিকে সোভিয়েত রকেট ইঞ্জিনিয়ার করোলিয়েভ সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা পাঠান, তাতে তিনি বলেন যে প্রাগ্রসর রকেটের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পৃথিবীর কক্ষপথে একটি উপগ্রহ পাঠালে ভালো হয় খুব, কারণ তাতে করে রকেট-বিজ্ঞানের গতির লয় অব্যাহত থাকবে, রাখা সহজ হবে। করোলিয়েভ কেন এমন পরিকল্পনা পেশ করেন তার প্রধান কারণ: ফন ব্রাউন। ফন ব্রাউন ছিলেন নাজী জার্মানির রকেট-ইঞ্জিনিয়ার। তিনি স্বদেশে হিটলারের সেনাবাহিনীর জন্য ভি-২ রকেট তৈরি করেন, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, ১৯৪৩ সাল থেকে জার্মানি মিত্রবাহিনীর শরীক যুক্তরাজ্যে বৃষ্টির মতো ভি-২ রকেট বর্ষণ করে; ফলে লন্ডন এবং যুক্তরাজ্যের অন্যান্য শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। যুদ্ধ শেষে - পরাজিত জার্মানির যেসব প্রতিভা ও বিজ্ঞানিকে 'অপারেশন পেপারক্লিপ' নামক সংস্থার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হয়, তাদের মধ্যে ফন ব্রাউনও ছিলেন।

নতুন দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ফন ব্রাউন রকেট-বিজ্ঞানী হিসেবে মার্কিন সরকার, সামরিকবাহিনী এবং বিজ্ঞান সমাজকে - রকেট ব্যবহার করে মহাশূন্য-ভ্রমণের আইডিয়া পেশ করেন। রকেট-বিজ্ঞানে, বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঝানু ফন ব্রাউনের উদ্যোগ আয়োজন দেখে করোলিয়েভ যে কিছুটা নার্ভাস আর কিছুটা ঈর্ষাপরায়ণ হননি, কে জানে। হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। তবে তাঁর প্রাগ্রসর রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর নিকটবর্তী কক্ষপথে পাঠানোর আইডিয়াটি ছিল তুলনাহীন।

ভেটারেন রকেটবিদ ভার্নার ফন ব্রাউন

১৯৫৫ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডুয়াইট ডেভিড আইজেনহাওয়ার ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বছরের উৎসব পালনের অংশ হিসেবে কর্মক্ষম একটি উপগ্রহ

উৎক্ষেপণ করা হবে। করোলিয়েভ তো পরিকল্পনা পেশের মাধ্যমে সরকারের উপরে আগে থেকেই চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছেন, এবারে আইজেনহাওয়ারের ঘোষণাটি সরকারের ওপরে আরেকটি বাড়তি চাপের কাজ করে। সোভিয়েত সরকার বুঝতে পারে যে ঢিমে তালে চলা চলবে না, উদ্যম প্রচেষ্টাকে গতিময় করতেই হয় এবং করা হয়।

সরকার কি রাজি হবে?

ফন ব্রাউন ছিলেন অভিজ্ঞ 'ভেটারেন' রকেটবিদ। ১৯৪৬ সালে তিনি মার্কিন র‍্যান্ড কর্পোরেশনকে পৃথিবীকে 'ঘূর্ণায়ণক্ষম নভোযান' নামক একটি প্রস্তাব পাঠান। তাতে তিনি যে রূপরেখা দেন, ছিল এরকম:

২২৭ কিলোগ্রাম ওজনের একটি রকেট পৃথিবী থেকে ৪৮০ কিলোমিটার উপরে অবস্থান নেবে ও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে, এবং পাঁচ বছরের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

অর্থাৎ ১৯৫১ সালের মধ্যে মার্কিন উপগ্রহ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে পারবে। কিন্তু সামরিক বিভাগ ফন ব্রাউনের প্রস্তাবটি অবজ্ঞা ভরে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু যখন স্পষ্টতর হয়ে যায় যে সোভিয়েতরা স্পুতনিক-১ কে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠাতে আদাজল খেয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তখন উর্ধ্বতন মার্কিন কর্মচারীরা ফন ব্রাউনের আইডিয়ার বৈজ্ঞানিক ও সামরিক সম্ভাব্য'র গুরুত্ব অনুধাবন করেন। অবশেষে ফন ব্রাউনের রূপরেখা সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়।

অবশ্য রকেট- প্রতিভা সের্গেই করোলিয়েভ ও তার টিমের অবস্থা যে ফন ব্রাউনের চেয়ে উত্তম ছিল, মনে করার কারণ নেই কোনো। যেমন : যারা সিদ্ধান্ত নেন, তাদের কেউ যদি 'পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে বিজ্ঞান করবে টা কী?'র মতো প্রশ্ন করেন তো তার সম্ভাব্য উত্তর রেডি থাকা দরকার। তাই না? তাদের প্রশ্নের উত্তর এরকম হতে পারে : গুরুত্বপূর্ণ অনেক অ-নে-ক বৈজ্ঞানিক রহস্য উন্মোচিত হতে পারে, যেমন : চাঁদের কক্ষপথকে বোঝা সহজ হবে আবহাওয়ার।

স্পুতনিক-১'-এর মাধ্যমে সের্গেই পাভলোভিচ করোলিয়েভ মানব-জাতিকে মহাশূন্য যুগে নিয়ে আসেন। করোলিয়েভ, সোভিয়েত রকেট-ইঞ্জিন ডিজাইনার ভালেন্তিন গ্লুশকো, ভার্নার ফন ব্রাউন'রাসহ

স্পুতনিক-১'-এর মাধ্যমে সের্গেই পাভলোভিচ করোলিয়েভ মানব-জাতিকে মহাশূন্য যুগে নিয়ে আসেন। করোলিয়েভ, সোভিয়েত রকেট-ইঞ্জিন ডিজাইনার ভালেন্তিন গ্লুশকো, ভার্নার ফন ব্রাউন'রাসহ আধুনিক রকেটবিদরা- সবাই কিন্তু কনস্তানতিন এড়ুয়ারডোভিচ সিয়োলকভস্কির কাছে ঋণী।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রভাব অতিক্রম করে দূরে অনেক দূরে যাওয়ার কথা বলেন দুঃসাহসী সিয়োলকভস্কি। রকেট ব্যবহার করে আমরা মহাশূন্য-ভ্রমণে বেরোতে পারি'র অনুপ্রেরণা দেন তিনি। করোলিয়েভ, গ্লুশকো, ফন ব্রাউন খুব মনোযোগ দিয়ে সিয়োলকভস্কির'র আইডিয়াগুলো পড়েছিলেন। ছিলেন তো আধুনিক 'অ্যাস্ট্রনটিক্স/কসমোনটিক্সের' পথিকৃৎ, প্রথম রকেট-বিজ্ঞানী।

আধুনিক রকেটবিদরা- সবাই কিন্তু কনস্তানতিন এডুয়ারডোভিচ সিয়োলকভস্কির কাছে ঋণী।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রভাব অতিক্রম করে দূরে অনেক দূরে যাওয়ার কথা বলেন দুঃসাহসী সিয়োলকভস্কি। রকেট ব্যবহার করে আমরা মহাশূন্য-ভ্রমণে বেরোতে পারি'র অনুপ্রেরণা দেন তিনি। করোলিয়েভ, গ্লুশকো, ফন ব্রাউন খুব মনোযোগ দিয়ে সিয়োলকভস্কির'র আইডিয়াগুলো পড়েছিলেন। ছিলেন তো আধুনিক অ্যাস্ট্রনটিক্স/কসমোনটিক্সের পথিকৃৎ, প্রথম রকেট-বিজ্ঞানী।

পূর্বাভাস আরো সঠিকভাবে হিসেব করা যাবে, হরেক রকমের মহাজাগতিক রশ্মি'কে উপলব্ধি করার পথ খুলে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কৃত্রিম-উপগ্রহ প্রজেক্ট যথেষ্ট ব্যয়বহুল বলে 'একাডেমি অব সায়েন্স' এর পক্ষে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ১৯৫৪ সালে এসব নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে আবেগপূর্ণ আলোচনা হয়। সোভিয়েত পদার্থবিদ পিত্র কাপিৎসা এবং অন্যান্যরা বলেন যে : কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে অজানার রাজ্যে প্রবেশের দ্বার খুলে যাবে, সব সময় - অজানাই বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধশালী করছে, তবে আগে থেকে বলা মুশকিল - কী সমৃদ্ধি সে আনবে। অতএব কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি হতেই হবে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে উপর মহলে চাপ সৃষ্টি করা হয় বইকি।

বিজ্ঞানী মহলে এই আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছুদিন বাদে, ১৯৫৪ সালের মে মাসে সোভিয়েত সরকার সামরিক প্রয়োজনে আর-৭ রকেট নির্মাণের নির্দেশ দেয়। করোলিয়েভ মোক্ষম সুযোগটি নেন, তিনি সামরিক-শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী দিমিত্রি উস্তিনভ'কে লেখেন যে - জানেন কী যে এই নতুন রকেটের সাহায্যে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে উৎক্ষেপণ করা সম্ভব, এবং আমি ও আমার টিম সেটি বানাতে পারব? তাই? চমৎকৃত উস্তিনভ বলেন, তাই যদি হয় তো অসুবিধা কী? কোনো অসুবিধা নেই। যেমন কথা তেমনি কাজ। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে পরিবর্তিত (মডিফায়েড) আর-৭ রকেট সৃষ্টির অনুমতি দেওয়া হয়।

মিশন বাস্তবায়নে ব্যস্ত করোলিয়েভ

করোলিয়েভের ইঞ্জিনিয়াররা একই সময়ে এক সঙ্গে তিন তিনটি উপগ্রহের ডিজাইনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রথমটির ডিজাইন বেশ জটিল, (নামও কেমন খটোমটো : অবজেক্ট ডি) - সেটিকে হতে হবে চোঙার মতো এবং তার ভেতরে থাকবে দুইশ থেকে তিনশ কিলোগ্রাম ওজনের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, দ্বিতীয়টির ডিজাইন মোটামুটি সহজ - তাতে একটি ক্যামেরা এবং একটি কুকুরের থাকবার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তৃতীয়টি হবে একদম সাদামাটা, তাই নাম হবে 'পিএস-১', বা মৌলিক উপগ্রহ।

১৯৫৬ সালের শেষ তখন, দৃশ্যত করোলিয়েভ বেশ নার্ভাস; হওয়ার অবশ্য কারণ রয়েছে। এই যে এই প্রথম উপগ্রহটির জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলো সময়মতো 'রেডি' হবে না। দিন কয় বাদে আসে নতুন বছর ১৯৫৭ সাল, আর জানুয়ারি মাসে মন্ত্রিসভা আর-৭ রকেটের উড্ডয়ন-টেস্ট প্রস্তাব অনুমোদন করেন। করোলিয়েভ তখন সরকারকে একটি নোট পাঠিয়ে অনুরোধ করেন - উপগ্রহকে যে পরিবর্তিত রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপণ করা হবে, সেটির উড্ডয়ন-টেস্ট যেন এই বছরের এপ্রিল বড়ো জোর মে মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। নোটে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। লেখেন যে আমরা আমাদের উদ্যমকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছি। আমার বিবেচনায়- জটিল গবেষণাগার সজ্জিত অবজেক্ট ডি (প্রথম উপগ্রহ)-এর বদলে, মহাশূন্যে পিএস-১ উৎক্ষেপণ করা হোক। করোলিয়েভের অনুরোধ মেনে নেওয়া হয়।

কয়েকটি অসফল উড্ডয়ন-টেস্টের পরে অবশেষে ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে আর-৭ রকেটের প্রথম সফল টেস্ট হয়। পরের মাসে দ্বিতীয় দফায় আর-৭-এর এবং পিএস-১-এরয়ের সফল টেস্ট সম্পন্ন হয়।

পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমে সংকেত পাঠানোর জন্য পিএস-১-কে ২০ মেগাহার্স এবং ৪০ মেগাহার্স কম্পনযুক্ত দুটো সংকেত-প্রেরক তথা ট্রান্সমিটার দিয়ে সজ্জিত করা হয়। এই দুই কম্পন সীমা বেছে নেওয়ার আসল লক্ষ্য ছিল- যাতে অ্যামেচার রেডিয়ো উৎসাহীরা জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই অনায়াসে উপগ্রহের সংকেত গ্রহণ করতে পারে।

প্লেনে ও হেলিকপ্টারে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা মোট ছয় রকমের সংকেত-প্রেরক তৈরি করেন, কিন্তু 'মহাশূন্যে' পৃথিবীর কক্ষপথে সংকেত-প্রেরক যে কতক্ষণ ধরে সংকেত পাঠাতে সক্ষম হবে বা পৃথিবীতে কেউ কি আদৌ কোনো সংকেত গ্রহণে সক্ষম হবে এ নিয়ে তাদের মহা-উৎকণ্ঠা ছিল।

(তারা তো তখন ভাবতেই পারেনি যে স্পুতনিক-১ যে বীপ-বীপ-বীপ সংকেত পাঠাবে- সেই সংকেতের ধ্বনিতে সারা পৃথিবী উতলা হবে, কান পেতে শুনবে, ম্যাগনেটিক রিবনে বন্দি হয়ে থাকবে এবং ষাট বছর পরেও আমরা সেই সংকেত শুনে শিহরিত হবো। বীপ-বীপ-বীপ লেজেন্ডে পরিণত হবে।)।

তাই কী করোলিয়েভ বোধ করি অতটা নার্ভাস হননি, তার কাছে- কোনো খুঁত নেই, টিপটপ সব। নার্ভাস হবেন কেন? সব রেডি। (কেবল মাত্র পিএস-১-এর ডিজাইনটি পছন্দ হচ্ছে না। গোলাকার হলে কী ভালো হতো না?)। উৎক্ষেপণ প্রস্তুতির পালা এখন।

প্রস্তুতি শুরু হলো

২২ সেপ্টেম্বর পরিবর্তিত আর-৭ রকেট'কে উৎক্ষেপণ-এলাকায় আনা হলো। আদি আর-৭ রকেটের তুলনায় পরিবর্তিতটি অত্যন্ত সাদামাটা, ওজনেও কম। ২৮০ মেট্রিক টনকে কমিয়ে আনা হয়েছে ২৭২ মেট্রিক টনে, দেখতে কেমন 'স্লিম' ভাব। অবশ্য 'স্লিম' হবেই বা না কেন? আদি রকেট আর-৭ এর যে অংশে বিস্ফোরক বা ওয়ারহেড রাখার জায়গা - সেটিকে সরিয়ে সেখানটায়, উপগ্রহটিকে রাখার জন্য, বিশেষভাবে ডিজাইনকৃত কনটেইনার বসানো রয়েছে; আদি রকেটের রেডিয়ো-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি ও টেলিমেট্রিও সরানো হয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয় শাট-ডাউন সিস্টেমটিকেও সরলীকরণ করা হয়েছে।

অক্টোবর মাসের দুই তারিখে করোলিয়েভ পিএস-১-এর উড্ডয়ন-টেস্ট অনুমোদন করেন। অর্থাৎ উৎক্ষেপক রকেট রেডি, পিএস-১ উড্ডয়নক্ষম।

অতএব, প্রস্তুতি শেষ। 'উড্ডয়নে সক্ষম' লিখে মস্কোতে তিনি নোট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু করোলিয়েভ কোনো উত্তর পান না। কী করবেন তিনি? সব রেডি - অথচ মস্কোর কোনো সাড়া নেই! এই নিয়ে টেনশন করতে রাজি নন তিনি। লোকজনকে ডেকে বলেন - উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে 'লোড' করো তোমরা।

অক্টোবর মাসের চার তারিখে, মস্কো সময় রাত দশটা আঠাশ মিনিটে 'পিএস-১ ওরফে স্পুতনিক-১' কে কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করা হয়। উড্ডয়নের কুড়ি সেকেন্ড বাদে রকেটের দ্বিতীয় পর্ব থেকে মডিউলটি পৃথক হয়ে যায় এবং উপগ্রহের সংকেত প্রেরক বা ট্রান্সমিটার কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। দিগন্তের দিকে ধাবিত উপগ্রহটির 'বীপ-বীপ-বীপ' সংকেত করোলিয়েভ ও তার টিমের সবাই শুনতে পান। সারা পৃথিবীও শুনতে পায়, পাচ্ছে, শুনছে। তবু উপগ্রহটির পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসা এবং বীপ-বীপ-বীপ সংকেত প্রেরণে একশ ভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য - টিমের সবাইকে নিয়ে করোলিয়েভ আরো প্রায় নব্বই মিনিট অপেক্ষা করেন। নিশ্চিত হন যে অপারেশন সাকসেসফুল - অতঃপর তিনি সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভকে ফোন করেন এবং সুসংবাদটি দেন।

মস্কো-অবজারভেটরির কাছে অবস্থিত একটি রেডিয়ো-কন্ট্রোল পোস্টে স্পুতনিক-১ কে মনিটর করা হচ্ছে (১৯৫৭)।

স্পুতনিক-১ আরো প্রায় তিন মাস পৃথিবীর কক্ষপথে অবস্থান করে, এবং প্রায় তিন মাসের অবস্থানকালে সে পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণ করে। ফলস্বরূপ কমবেশি ষাট মিলিয়ন কিলোমিটার পথ সে অতিক্রম করে। তার সংকেত-প্রেরকটি উড্ডয়নের পরে দুই সপ্তাহ ধরে নন-স্টপ কাজ করে যায়। অবশ্য স্পুতনিক-১ উচ্চতা ও বেগ দুই-ই ক্রমশ হারাচ্ছিল। অবশেষে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে স্পুতনিক-১ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং পুড়ে শেষ হয়ে যায়। ১৯৫৮ সালের একত্রিশে জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক্সপ্লোরার-১ নামক তাদের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে।

বাইকোনুরের উৎক্ষেপক-প্যাডে স্পুতনিক-১ উৎক্ষেপণের অপেক্ষা করছে (১৯৫৭)।

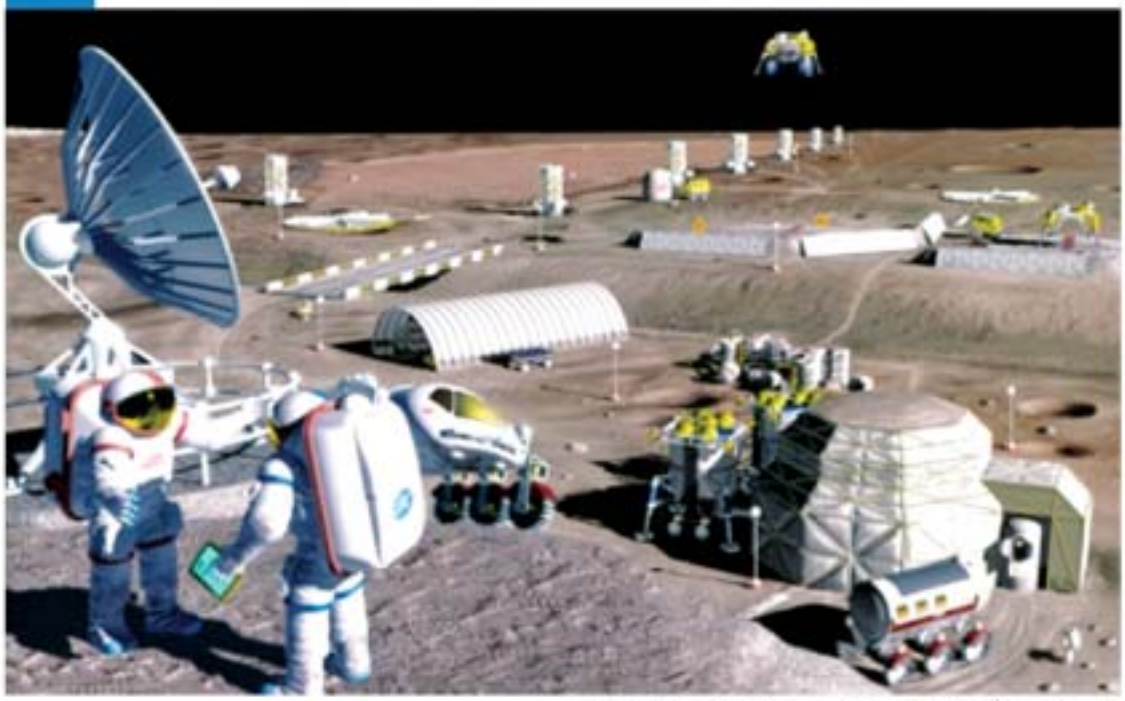

চাঁদের চিঠি

হেনা সুলতানা

আজ দুইদিন হলো শুভর খুব ব্যস্ততা বেড়েছে। অন্যদের কাছে এ ব্যস্ততা তেমন কিছু মনে না হলেও তার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

শুভর কম্পিউটারে একটা ই-মেইল এসেছে। আজকাল আমরা যাকে ই-মেইল বলি তাকেই নাকি আগে চিঠি বলত লোকে। ই-মেলটা সে যাকে পাচ্ছে তাকেই দেখাচ্ছে। একটু প্রাচীন যারা তাদেরকে আবার বিষয়টা বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে। তা হোক, কাজটা করছে সে খুব খুশি মনে। শুভ তার দাদির কাছে গল্প শুনেছে যে আগে চিঠি লেখা হতো কাগজে কলমে। তারপর সেই চিঠি ভাঁজ করে খামে ভরা হতো। তারপর প্রাপকের নাম, ঠিকানা লিখে পোস্ট অফিস নামের একটা ঘর থেকে টিকিট লাগিয়ে সিল মেরে তবেই পাঠাতে হতো। তার জন্যে কিছু টাকা খরচ করতে হতো। প্রাপকের কাছে সেই চিঠি পৌঁছতে সময় লাগত তিন-চার দিন। কখনো এক সপ্তাহও পেরিয়ে যেত। কী অদ্ভুত!

দাদার কাছে শুনেছে তারও আগে নাকি ছিল ঘোড়ার ডাক। এর মানে হচ্ছে ঘোড়ার পিঠে করে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে চিঠি যেত। সেটি প্রচলন করেছিলেন শের শাহ্ নামের এক রাজা। সে প্রায় সাতশ বছর আগের কথা।

পাখিও মানে কবুতর নাকি চিঠি আদান-প্রদানের কাজ করত। পাখিরা অবশ্য যেখানে খুশি যত দূরে ইচ্ছে চলে যেতে পারে। কাজটা ওরা এখনো করে কি-না সে জানে না।

সে যাক, আপাতত শুভর চিন্তা তার কাছে আসা ই-মেইলটা নিয়েই। ই-মেইল পাঠিয়েছে চাঁদের দেশ থেকে নৈঋতা। নৈঋতার ই-মেইলের কী উত্তর দেবে তাই সে ভাবছে। নৈঋতা ওর স্কুলের বন্ধু। শুভর সাথে তার দেখা হয়েছিল এই বছর খানেক আগে। বাবা-মার সাথে আমেরিকায় থাকবে বলে সে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল। তখন শুনেছিল নিউইয়র্কের লুনার রিপাবলিক সোসাইটির মাধ্যমে ওর বাবা চাঁদের দেশে জমি কিনে রেখেছিলেন। এখন সেখানে বাড়ি বানিয়ে আছেন। শুভ মনে মনে ভাবে ওদের তো ভারি মজা। চাঁদের দেশে থাকে। সেখানে পৃথিবীর মতো ভিড়ভাট্টা নেই, নেই গাড়ি ঘোড়ার জ্যাম। কোচিং-এর যন্ত্রণা নেই, নেই ছেলেধরা,

পকেটমার, শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ। নেই অন্য কোনো ঝুটঝামেলা। তাহলে আছেটা কী? সেই যা আছে তাই নিয়ে ওর বিশাল লেখা।

নৈঋতা কত কী যে লিখেছে ওদের চাঁদের দেশের কথা, সে সব পড়তে পড়তে এক সময় নৈঋতার জন্যে তার মনটা আইঢাই করে ওঠে। ও কত দূরে গেছে, কিন্তু তাকে তো ভোলেনি! ভোলেনি পুপু, টুসি, সুজন,স্বর্ণা, ঋষভের কথা! প্রায় দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূর থেকে তার জন্য ই-মেইল পাঠিয়েছে। শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা জানাতে ভোলেনি রুপোস, সুমন, রুপাই আর আনন্দকে।

নৈঋতা লিখেছে তার খুব মন খারাপ। কারণ ওখানে আমাদের মতো কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। থাকবে কী করে ? সেখানে লোকজনই তো কম। তার বাবা বিজ্ঞানী। সারাদিন গবেষণার কাজ করেন। মাও কাজ করেন। ঘরের ভেতরেই তাদের অফিস। কাচের মতো স্বচ্ছ এক ধরনের ফাইবার দিয়ে বাড়িগুলো বানানো। আর সে লেখাপড়া করে ল্যাপটপে, ইন্টারনেটে কোন এক বিখ্যাত স্কুলে। লেখাপড়া চলছে, পরীক্ষা চলছে, রেজাল্টও হচ্ছে কিন্তু কোনো আনন্দ নেই।

নৈঋতা লিখেছে,

'স্কুলে আমার সবচেয়ে পছন্দ ছিল টিফিনের ঘণ্টা। টিফিনের ফাঁকে বন্ধুদের সাথে খেলার যে কী মজা তা আমি এখানে কোথায় পাবো? জানিস, আমার ছুটির ঘণ্টা শুনতে খুব ইচ্ছে করে। কতদিন শুনি না টুন-টুন-টুন-টুন ন ন ন সেই একটানা মিষ্টি শব্দ। বেশিরভাগ সময় আমি একাই থাকি। একা একা থাকতে থাকতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। মা বলেছে আরো পনেরো বছর পর আমরা পৃথিবীতে ছুটি কাটাতে যাবো। পনেরো বছর শুনে আবার ঘাবড়ে যাস না। এখানে মাত্র সাতাশ দিনেই বছর। প্রতিবেশীদের সাথে খুব একটা যোগাযোগ নেই। অনেক দূরে দূরে একেকটা বাড়ি। সবাই যে যার মতো কাজে ব্যস্ত খুব। কেউ অকারণে সময় নষ্ট করে না এখানে।

আমি কদিন ধরে খুব মনমরা হয়েছিলাম। তাই আমাকে নিয়ে বাবা আর মা বেড়াতে গিয়েছিল একটা ঐতিহাসিক জায়গায়। আমরা যে এলাকায় থাকি তার চারদিকে শুধু ব্যাসেল্ট মেশানো কালো কালো পাথরের মরুভূমি। দেখে মনে হয় একটা কালো সমুদ্র ঢেউ খেলে যাচ্ছে তার ভেতরে। সি অফ রেনস পেরিয়ে অনেকটা দূরে বাঁ দিকে বে অফ রেনবো সেখানে অনেকটা ফাঁকায় দাঁড়িয়ে আছে জুরা পাহাড় একেবারে ন্যাড়া খাড়া। তারই কাছাকাছি আমাদের বাড়ি। ওখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় যেখানে নীল আর্মস্ট্রং আর এডউইন অলড্রিন ঈগল নামের চন্দ্রতরী থেকে নেমে চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রেখেছিল। এ জায়গাটা এখন বিশাল পর্যটন এলাকা। আমার বানানো বাংলাদেশের একটা পতাকা টানিয়ে দিয়ে এসেছি। সেখানে যারাই যায় নিজের দেশের পতাকা টানিয়ে দিয়ে আসে। ওখানে গিয়ে আমার কী যে আনন্দ হয়েছিল তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। তোদের কথা খুব মনে পড়ছিল। তোদেরকে কাছে পেলে মজা করে চড়ুইভাতি করতে পারতাম।

বিকালটা হলে আরো বেশি করে মনে পড়ে তোদের কথা। খেলবার জন্য মনটা বড়ো ছটফট করে। কিন্তু

কোনো উপায় নেই। বাড়ির বাইরে এলে একটা করে অক্সিজেনের ব্যাগ পিঠে নিয়ে বের হতে হয়। পৃথিবীতে যেমন স্কুল ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেতাম। এও ঠিক সে রকম। পিঠে ব্যাগ চাপিয়ে কী ছুটোছুটি করা যায়? এই জিনিসটা এখানে ফেরিওয়ালারা বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বেড়ায়।

শুভ তোর মনে আছে স্কুল থেকে আমরা একবার জাহাজে করে সুন্দরবন দেখতে গিয়েছিলাম। তখন ঝকঝকে জোছনা রাত ছিল। সবাই মিলে কত আনন্দ করেছি। সাগর, কত রকমের গাছ আর পশুপাখি দেখেছি। রাতের বেলায় থেকে থেকে কাক ডাকছিল। পুরবি মিস বলছিলেন এই রকম জোছনাকে কাক জোছনা বলে। চাঁদেও তো নিজের কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোয় সে আলোকিত। জোছনা দিনের আলোর মতো জ্বলজ্বল করে বলে কাকেরা মনে করে ভোর হয়ে গেছে। তাই ওরকম ডাকাডাকি করে। অন্যান্য টিচাররা চাঁদ নিয়ে যত গল্প আছে সব শুনিয়ে ছিলেন। চাঁদের বুড়ি চরকায় সুতো কাটছে। সেই কথা শোনার পর আমরা আর চাঁদের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। সবাই খুব করে খেয়াল করছিলাম কীভাবে চাঁদের বুড়ি চরকায় সুতো কাটে। চাঁদকে নিয়ে পৃথিবীর মানুষ ইচ্ছামতো গল্প বানিয়েছে, কত কত গল্প আর গান, কবিতা তার কোনো শুমার নেই। চাঁদের দিকে তাকিয়ে সুলতানা মিস গান শুনিয়ে ছিলেন – আয় আয় চাঁদমামা, টিপ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা। আর আমাদের সবার কপালে একটা করে চাঁদের টিপ দিয়ে দিচ্ছিলেন। সেই স্মৃতি আমি আজও ভুলতে পারিনি।

মায়ের সাথে চাঁদের কী সম্পর্ক কে জানে। তবু সবাই চাঁদকেই মামা বলে ডাকবে যেন কত আপন সে আমাদের। আপনই তো। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে হচ্ছে চাঁদ। জানিস সেই রকম জোছনা এখানে দেখতে পাই না। সেই রকম বলছি কেন – কোনো জোছনা তো এখানে দেখতে পাই না রে। আমি কেমন বোকা দেখ! পৃথিবীতে থাকতে চাঁদের দেশে চাঁদ দেখতে পাবো না তা কখনো ভাবতেই পারিনি। এখানে এসে দেখলাম চাঁদের আকাশে সত্যিই কোনো চাঁদ নেই। আলো নেই। মানে জোছনা নেই। আমার মায়ের সে কী চিন্তা, চাঁদ দেখা না গেলে ঈদ হবে কী করে? বাবা বলেছে ঈদের চাঁদ দেখা গেলে পৃথিবী থেকে টিভিতে খবর আসবে। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

সন্ধ্যে লাগতেই চারদিক কেবল শুনশান অন্ধকার। নেই গাছপালা, ঘাসের উপরে শিশির নেই, নেই গাড়িঘোড়া। নেই শীত-বসন্ত, গ্রীষ্ম-বর্ষা। আরোও কত কী যে নেই সে হিসেব শুনলে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সেই যে অংকের স্যার আমাদের বলতেন, মানুষ পারে না হেন কাজ নেই। আর তোরাই কেবল অংক বুঝে করতে পারিস না। আমার মনে হয় কী জানিস, চাঁদটাকেও মানুষ পৃথিবীর মতো বাসযোগ্য করে তুলবে। তখন পৃথিবীটা হবে আমাদের পুরনো বাড়ি।

তাই বলে ভাবিস না পৃথিবীর সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তা নয়। চাঁদ তো পৃথিবীর উপগ্রহ। মহাশূন্যে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আমাদের চাঁদ। আর তাই খুব সহজেই পৃথিবী থেকে সবকিছু নিয়ে আসে গ্যাগারিন নামে একটি নভোযান। পৃথিবী থেকে স্পেসশিপ ছাড়াও চাঁদে যাতায়াত করে আরো কয়েকটি নভোযান। সে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। গ্যাগারিন খুব নাম করা। ইউরি গ্যাগারিন মহাশূন্য অভিযানে প্রথম নভোযাত্রী হবার গৌরব অর্জন করে ছিলেন। তাই তার নাম স্মরণীয় করে রাখবার জন্য নভোযানটির নাম রাখা হয়েছে গ্যাগারিন। তিনি ছিলেন রাশিয়ান।

তোরা সব কেমন আছিস? পড়াশুনার পাশাপাশি নিশ্চয়ই অনেক মজার মজার বই পড়ছিস। আলোর ফুলকি বইটা খুব পড়তে ইচ্ছে করছে রে। চাঁদের পাহাড় আর ঠাকুরমার ঝুলি। একটা প্রজাপতি ডিজাইনের ঘুড়ি ওড়াতে বড়ো মন চায়। লাটাইটা হাতে, যেমন ইচ্ছে ঘুরাবো ঘুড়িটাকে। ল্যাপটপেই ছবি আঁকি কিন্তু তাতে মন ভরে না। আসবার সময় আনতে ভুলে গিয়েছিলাম, একটা রং পেন্সিলের বক্স পেলে মনের মতো করে ছবি আঁকতাম। মেজো মামা বলেছে পাঠিয়ে দেবে। তবু কিছুটা সময় কাটবে।

সানাই, মন্টাই ওরা কী এখনো আমার কথা বলে? আমি কিন্তু তোদের কথা সব সময় মনে করি। যখন চাঁদ দেখবি তখন ঠিক আমার কথা মনে পড়বে।

তোদের সবার কথা লিখে জানাবি কিন্তু। ভালো থাকিস শুভকামনা রইল।

ইতি

তোদের বন্ধু নৈঋতা

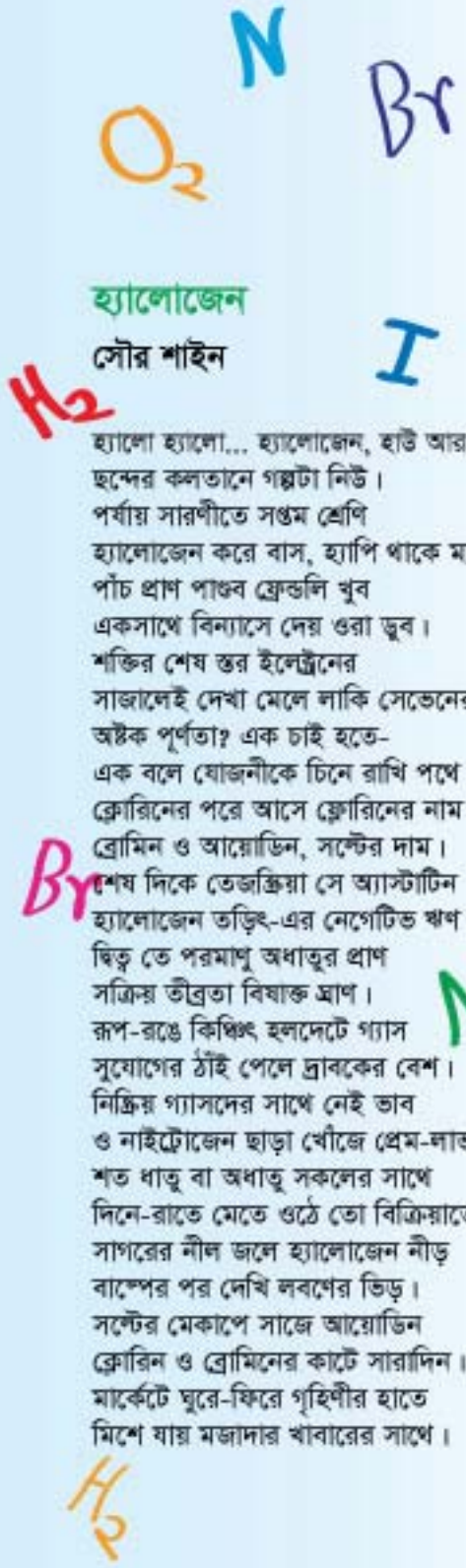

হ্যালোজেন

সৌর শাইন

হ্যালো হ্যালো... হ্যালোজেন, হাউ আর ইউ?
ছন্দের কলতানে গল্পটা নিউ।
পর্যায় সারণীতে সপ্তম শ্রেণি
হ্যালোজেন করে বাস, হ্যাপি থাকে ম্যানি।
পাঁচ প্রাণ পাণ্ডব ফ্রেন্ডলি খুব
একসাথে বিন্যাসে দেয় ওরা ডুব।
শক্তির শেষ স্তর ইলেক্ট্রনের
সাজালেই দেখা মেলে লাকি সেভেনের।
অষ্টক পূর্ণতা? এক চাই হতে-
এক বলে যোজনীকে চিনে রাখি পথে।
ক্লোরিনের পরে আসে ফ্লোরিনের নাম
ব্রোমিন ও আয়োডিন, সল্টের দাম।
শেষ দিকে তেজস্ক্রিয়া সে অ্যাস্টাটিন
হ্যালোজেন তড়িৎ-এর নেগেটিভ ঋণ।
দ্বিত্ব তে পরমাণু অধাতুর প্রাণ
সক্রিয় তীব্রতা বিষাক্ত ঘ্রাণ।
রূপ-রঙে কিঞ্চিৎ হলদেটে গ্যাস
সুযোগের ঠাঁই পেলে দ্রাবকের বেশ।
নিষ্ক্রিয় গ্যাসদের সাথে নেই ভাব
ও নাইট্রোজেন ছাড়া খোঁজে প্রেম-লাভ।
শত ধাতু বা অধাতু সকলের সাথে
দিনে-রাতে মেতে ওঠে তো বিক্রিয়াতে।
সাগরের নীল জলে হ্যালোজেন নীড়
বাষ্পের পর দেখি লবণের ভিড়।
সল্টের মেকাপে সাজে আয়োডিন
ক্লোরিন ও ব্রোমিনের কাটে সারাদিন।
মার্কেটে ঘুরে-ফিরে গৃহিণীর হাতে
মিশে যায় মজাদার খাবারের সাথে।

মজার ধাঁধা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য রইল কিছু ধাঁধা। মেলানোর চেষ্টা করো দেখি! মেলাতে পারলে তো তোমার বুদ্ধির তারিফ করতেই হবে। নিচে তো উত্তর দেওয়াই থাকছে।

১. তিনটি আপেল থেকে দুটি আপেল তুমি নিয়ে নিলে। তাহলে তোমার কাছে আর কয়টা আপেল থাকল?

২. এক ফুটবলের পাগল বলল, সে খেলা শুরু হওয়ার আগেই খেলার স্কোর বলতে পারবে। কীভাবে পারবে?

৩. তোমাকে বলা হলো আগুন জ্বালাতে। তোমাকে এজন্য দেওয়া হলো কেরোসিন, কাগজ, মোমবাতি, ম্যাচ বাক্স আর উলসুতা। তুমি কোনটা আগে জ্বালাবে?

৪. বলো তো বন্ধুরা, ডাব না খেলে কী হয়?

৫. তিন অক্ষরে নাম যার জলে বাস করে, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে আকাশে উড়ে।

উত্তর

১. দুটো আপেল নিলে তো তোমার কাছে দুটো আপেলই থাকবে। তাই না?

২. এটা বলা তো খুবই সহজ। ফুটবল খেলা শুরু হওয়ার আগে স্কোর সবসময়ই ০-০ হয়!

৩. অবশ্যই ম্যাচের কাঠি।

৪. ডাব থেকেই তো নারকেল হয়। তাই না!

৫. পানিতে বাস করে চিতল, আর চিতলের 'ত' বাদ দিলে চিল আকাশে উড়ে।

একদিন জন্মদিন

জোহরা শিউলী

বুকটা ধুক ধুক করছে উৎসের।

সময় এখন টিফিনের।

একবার নিজের ব্যাগের দিকে তাকায়। আরেকবার আড়চোখে ক্লাশের সবাইকে।

কিছুটা ক্ষুধার্ত সবাই। বাসা থেকে আনা টিফিন খাবে এখন। হাতে বানানো রুটি আজ তার টিফিন। সাথে আছে মিষ্টি। অন্য দিন টিফিনের সময়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। হালুম বাঘটা যে পেটে ঢুকে পরে। আশেপাশে সবার এত মোহনীয় টিফিন। তবে মায়ের বানানো খুব সাদামাটা টিফিন-ই মজা করে খায় সে। কোনোদিন ভাতভাজি, সবজি দিয়ে নুডুলস, রুটির সাথে আলুভাজি, পাউরুটি মিষ্টি দিয়ে। এমন-ই টিফিন থাকে উৎসের।

বাবার চাকরিতে উপার্জন খুব বেশি নয়। তাই হিসাব করা সংসার। সেই হিসাবের রুটিনেই চলতে হয় মাকে। বাড়তি খরচ করার কোনো সুযোগ নেই। আজকের এই রুটি-মিষ্টি অন্য দিন হয়ত খেয়ে ফেলত আনন্দসহকারেই। কারণ মিষ্টিটা বড়োমামা এনেছেন। এত মজার মিষ্টিটা আজ ভালো লাগছে না। শুকনো রুটিটাও গলা দিয়ে নামছে না।

আজকের দিন যে একটা বিশেষ দিন।

আজ উৎসের জন্মদিন।

কাল রাতে মা খুব আদর করেছে।

ঘুম পাড়িয়েছে মাথায় বিলি কেটে।

আজকে জন্মদিনের কারণে পায়েস রান্না করবে বিকেলে। তবে কাউকে দাওয়াত দেওয়া হবে না। বাবা-মা, ছোটো তুলতুল আর সে। কেক কেটে জন্মদিন করার মতো টাকা নেই। এ কারণে কাউকে বলা হয় না। সহপাঠীদের সবার জন্মদিন করা হয়। তাকে দাওয়াতও দেয়। তবে বাবার কড়া নির্দেশ। সবার দাওয়াতে যাবার দরকার নেই। খুব কাছের দু-একজন ছাড়া । উপহার কেনার একটা ব্যাপার আছে। বাড়তি পয়সা খরচ করা যাবে না। বাবার

সীমিত উপার্জন। সহপাঠীরা জন্মদিনের পরদিন কেক নিয়ে আসে। গল্প করে জন্মদিনে কে কী গিফট পেয়েছে। মাঝে মাঝে উৎস সেই গল্পও শুনে চোখ গোল গোল করে। আর অবাক হয় সে।

সবার জন্মদিনে এত মজার মজার ঘটনা। মজার মজার খাবার। অথচ উৎসের জন্মদিনের কোনো সুযোগ নেই।

জন্মদিন পালন না হোক। বন্ধুরা পরদিন সবার জন্য কেক নিয়ে আসে। তারও ইচ্ছে করে কিছু খাওয়াতে।

মাকে ইচ্ছের কথা জানালো উৎস।

মা একটা বুদ্ধি দিলেন।

ছোটো মাটির ব্যাংক আছে তার। বাবা তাকে কয়েন দিতেন। কখনো দুই টাকার। কখনো পাঁচ টাকার কয়েন। কয়েনগুলো ব্যাংকে জমাতো উৎস। সেই ব্যাংকটা ভেঙে ফেলা যায়। মাথায় আইডিয়া আসার মতো বলেন মা। কেক না হোক। বন্ধুদের তো চকলেট খাওয়ানো যায়।

যেই ভাবা সেই কাজ। ভাঙা হলো ব্যাংক। গোনা হলো পয়সা। সব মিলিয়ে ২৬৫ টাকা। ১৮ জন সহপাঠী তার। খুব সহজেই কেনা হলো চকলেট। সেই চকলেট-ই এখন তার ব্যাগে।

টিফিন খাবার পর চকলেটগুলো দিবে সে। এমন-ই পরিকল্পনা। তবে মাথায় ভাবনা কাজ করছে। যদি বন্ধুরা চকলেট পছন্দ না করে? কম দামি বলে কেউ যদি না নেয়? কেমন যেন সংকোচ লাগছে। কেন যে মায়ের সাথে কথাটা বলল? মাথায় একটা বুদ্ধি আসল। কাউকে দেওয়ার দরকার নেই চকলেট। বলার দরকারই নেই আজ তার জন্মদিন।

কিন্তু মাকে কী বলবে?

মায়ের তো মন খারাপ হবে চকলেট ফিরিয়ে নিলে। চকলেটগুলোও তো অপচয় হবে। বাবা-মা অপচয় পছন্দ করেন না। সবাইকে চকলেট দেওয়া হবে। এই ভাবনাতে মাও কত খুশি হয়েছিল। এখন ফিরিয়ে নিলে মন খারাপ করবে।

টিফিন খাওয়া শেষ সবার।

মায়ের মুখটা চোখের সামনে। খুশি খুশি মুখ।

মাথায় ভাবনা ঘুরপাক খায়। কী করে দেই চকলেট!

এরই মাঝে একটা কেক। লোপা মিসের হাতে। টিফিনের সময়টাতে লোপা মিসের ডিউটি থাকে। কেকটা টেবিলে রাখলেন তিনি। মুচকি মুচকি হাসছেন মিস উৎসের দিকে তাকিয়ে।

এবার লোপা মিস ডাকলেন তাকে আর আবীরকে।

বোর্ডের কাছে গেল তারা দুজন। যাওয়ার পর অবাক। কী সুন্দর ডোরেমনের একটা কেক।

'শুভ জন্মদিন উৎস ও আবীর'। কেকটিতে লেখা।

হ্যাপি বার্থ ডে...হ্যাপি বার্থ ডে...টু ইউ । ক্লাশের সবাই গাওয়া শুরু করল এই গান।

'তোমাদের দুজনের একই দিনে জন্মদিন। আমি তোমাদের জন্য কেকটা আনিয়েছি। সবাই মিলে কেক কাটবে। আর মজা করবে। আমি তোমাদের অনেক ভালোবাসি।' দুজনকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন লোপা মিস।

এত আনন্দ লাগছিল তার মনে। আবীরও খুব খুশি। কেক কাটা হলো। সবাইকে কেক দেওয়া হলো। কেকের সাথে উৎস চকলেটগুলোও দিল।

কেক, চকলেটে মাখামখি হলো ক্লাশ। আর আনন্দরা ঘিরে ধরল তাদের। অনেকটা প্রজাপতির মতো। উড়ে উড়ে ছুঁয়ে গেল।

কৌতুক

খালি চোখে দেখা যায় না

শিক্ষক: তোকে তো ব্যাকটেরিয়ার চিত্র আঁকতে বলেছিলাম। তুই তো দিলি সাদা কাগজ। কেন?

ছাত্র: স্যার, আমি তো ব্যাকটেরিয়ার চিত্রই এঁকেছি। আপনি তো ব্যাকটেরিয়া খালি চোখে দেখতে পারবেন না!!!

বাণী চিরন্তন

অন্ধকারে একজন বন্ধুর সাথে হাঁটা আলোতে এক হাঁটার চেয়ে ভালো।

-হেলেন কিলার

দ্বিজেন শর্মা [জন্ম: ২৯ মে ১৯২৯ - মৃত্যু: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭]

মহীরুহ

হেনা নুরজাহান

বন্ধুরা, তোমাদের এক দেবতুল্য মহীরুহের গল্প বলব। পরিবারের ছোটো তাই খোকা বলে ডাকে সবাই। মা বলতেন ঠিকানা লাগবে না, শহর ঘুরে যে বাড়ির সামনে একটা বাগান দেখবে সে বাড়ি ঢুকে পড়বে। তারপর ঘরে উঁকি দিয়ে যদি দেখো বারান্দায় বই ঠাসা একটা বাক্স তাহলেই নিশ্চিত জানবে আমার খোকা এখানে থাকে। ঠিকানা জানতে চাইলে তার মায়ের এমন বর্ণনাই বলে দেয় তিনিই আমাদের বৃক্ষাচার্য প্রকৃতি বন্ধু– নিসর্গ সখা অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা।

বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার পাথারিয়া পাহাড়ের শিমুলিয়া গ্রামে ২৯ মে, ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম। পিতা চন্দ্রকান্ত শর্মা, মাতা মগ্নময়ী দেবী। পিতা ভিষক (কবিরাজ) তাই বাড়ির চারপাশ গাছগাছড়ায় ভরপুর। বসন্ত শেষের বৃষ্টির পর সারা বাড়ি ফুলে ফুলে ভরে যেত। নাগেশ্বর, মাকড়িশাল, কুর্চি, স্বর্ণচাঁপা, কণকচাঁপা, মুচকুন্দ, লোধ, দুর্লভ লংমালতি ও মধুমালতির পত্র-পুষ্পের সৌরভে স্বর্গ নেমে আসে ধরাধামে এই ব্রাহ্মণ বালকের কাছে। তিনি নিজেই বলেন, সেইসব আশ্চর্য দিনে পৃথিবীর সব কিশোরের মতো আমিও প্রকৃতির প্রেমে পড়েছিলাম। নিসর্গ প্রেমে আত্মলীন থেকে নিজেকে উৎসর্গ করলেন মানুষ ও প্রকৃতির সেবায়। প্রকৃতির পাঠ গ্রহণ করেন আপন আত্মায়-নিসর্গী, প্রকৃতিপুত্র, বৃক্ষসখা, নিসর্গসখা, বৃক্ষাচার্য, বৃক্ষদের প্রাতঃস্মরণীয়- এরকম অসংখ্য বিশেষণে তাঁকে ভালোবাসা জানান প্রকৃতিপ্রেমী বন্ধুরা।

নিকড়ি নদীর জল স্নাত সবুজ ধানক্ষেত, দূরদিগন্তে খাসিয়া পাহাড়ের নীলাভ ঢেউ, লালঘণ্টা আর রক্তকাঞ্চন সজ্জিত পাহাড়ি পথের এই কিশোর পথিক গ্রামের পাঠশালা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে মাধ্যমিকে পড়ার সময় দুরন্ত উদ্যমে প্রকৃতি প্রেমে নিজেকে করলেন সমর্পন। আদিবাসী বন্ধুদের সাথে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো, পিঠে তীর-ধনুক,ফাঁদ দিয়ে পাখি শিকার এ এক অদ্ভুত নেশায় বিভোর কিশোর সারা দিনমান জঙ্গলে জঙ্গলে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফিরতেন বাড়ি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'সহ আরো অনেক বইয়ের পাঠ এর মধ্যে সম্পন্ন করে ফেলে এই প্রকৃতি বালক। যখন যুগল প্রসাদের নিসর্গ প্রেম ও লবটুলিয়ার জঙ্গল নিয়ে রীতিমতো আচ্ছন্ন তখন মা মগ্নময়ী দেবী ভাবলেন এরকম চলতে থাকলে খোকার পড়ালেখা হবে না। তাই তাঁকে শহরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো।

করিমগঞ্জ শহরে দিদির বাড়ির বিশাল উঠানে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেদিন তাকে ঘিরে লোকজন রীতিমতো হাসাহাসি শুরু করে দেয়। পিঠে ঢাউস ধনুক,তাতে বাঁধা অনেকগুলো তীর। খেলনা নয়, জীবজন্তু মারার আসল অস্ত্র। আদিবাসী এক পাহাড়ি বালককে দেখে অবাক বিস্ময়ে যখন কানাঘুষা শুরু হয়ে যায় তখন অন্দর থেকে দিদি বেরিয়ে এসে ভাইকে হাত ধরে

ঘরে নিয়ে গেলে রক্ষা। সেই থেকে শহুরে জীবন শুরু। নিত্য গ্রাম প্রকৃতিতে পড়ে থাকত প্রাণ-মন।

মা'র ইচ্ছা ছেলে চিকিৎসক হবে তাই ডাক্তারি পড়তে কলকাতা কিন্তু পৌঁছতে দেরি হওয়ায় মেডিকেলে পড়া হয়নি, ভর্তি হলেন সিটি কলেজে জীববিদ্যায়। উদ্ভিদবিদ্যায় ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পড়েন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ ও নটরডেম কলেজ ঢাকায় অধ্যাপনা করেন প্রায় ষোলো বছর, পরে মস্কো'র বিখ্যাত প্রগতি প্রকাশনে অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন বিশ বছর। অতঃপর স্বদেশে ফিরে এসে অরণ্য প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা আর লেখালেখিতে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

মস্কো যাওয়ার আগে ১৯৬৫ সালে ঢাকার বৃক্ষরাজি নিয়ে তাঁর বিখ্যাত ও নিসর্গী পরিচায়ক গ্রন্থ *শ্যামলী নিসর্গ*"র পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে যান বাংলা একাডেমিতে। অবশেষে ১৯৮১ সালে প্রকৃতি পাঠ সহায়ক মহামূল্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। চল্লিশটির মতো গ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি প্রায় ষোলোটি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন নিসর্গের এই বিস্ময় বালক। যিনি একাধারে শিশুসাহিত্যিক, গবেষক, বিজ্ঞান লেখক, উদ্ভিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের অকৃত্রিম শিক্ষক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে- *শ্যামলী নিসর্গ*, *ফুলগুলি যেন কথা*, *নিসর্গ নির্মাণ ও নান্দনিক ভাবনা*, *সমাজতন্ত্রে বসবাস*, *বাংলার বৃক্ষ*, *চার্লস ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি*, *সপুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণি বিন্যাস তত্ত্ব*, *বিজ্ঞান ও শিক্ষা*, *দায়বদ্ধতার নিরিখ*, *গহীন কোনো বনের ধারে*, *বিগল যাত্রীর ভ্রমণকথা*, *হিমালয়ের উদ্ভিদ রাজ্যে ডাল্টন হুকার*, *কুঁড়ি তোমার লাগি*। ছোটবন্ধুরা, তোমাদের জন্য লিখেছেন- *জীবনের শেষ নেই*, *এমি নামের দুরন্ত মেয়েটি*, *গাছের কথা ফুলের কথা*, *সতীর্থ বলয়ে ডারউইন*।

নির্মোহ ও নিভৃতচারী এই প্রাজ্ঞ তাঁর বিরাট কর্মযজ্ঞের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান 'একুশে পদক', 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার','কুদরত-এ-খুদা স্মৃতি স্বর্ণপদক', এম নুরুল কাদের শিশুসাহিত্য পুরস্কার'সহ অসংখ্য সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন মানুষের ভালোবাসায়। ২০১৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে পৃথিবীবাসীকে বিদায় জানিয়ে অন্যলোকে পাড়ি দিয়ে মিশে গেলেন নিসর্গেরই মাঝে।

বৃক্ষাচার্য এই নিসর্গ বালক বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে উদ্যানের নগরী বানাতে চেয়েছিলেন। বাংলার বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভার আদলে ঢাকা তথা দেশের সকল শহরে নান্দনিক নিসর্গ নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন। আমৃত্যু রমনা পার্কের সযত্ন সেবা করে গেছেন মেধা-কর্ম ও শ্রম দিয়ে।

শিশুদের বড়ো ভালোবাসতেন তিনি। তাঁর ভালোবাসার শিশুরা তাঁর মতো করেই প্রকৃতিকে ভালোবাসবে, তাই না বন্ধুরা?

নবারুণ-এর গ্রাহক কুপন

এই অংশটুকু কেটে ডাকে পাঠাতে হবে অপর পৃষ্ঠার ঠিকানায়

গ্রাহকের নাম ....

ঠিকানা .... ফোনঃ ....

৬ মাস	১২ মাস	প্রতি কপির মূল্য	মোট মূল্য
		২০/-	

গ্রাহকের স্বাক্ষর

মাটি আর নাবা দুই বোন। নাবা ছোটো তাই সবসময় মাটির গলা জড়িয়ে থাকে।

মাটির গুটিবসন্ত হলে ডাক্তার দুই বোনকে আলাদা রাখতে বলে। কিন্তু তাদের আলাদা রাখা যায় না। মাটির পরে নাবারও রোগটি হয়। মাটির চেয়ে নাবার বেশি হয়।

নাবার কষ্টে মাটি কান্নাকাটি করে। মাটি স্কুলে গেলে নাবা একা হয়ে যায়। সে মাটিকে সারা ঘর খুঁজে বেড়ায়। সে মাটিকে না পেয়ে বারান্দায় একা একা বসে থাকে। বারান্দায় ঝুলে থাকে।

কেমন হলো, বলত?

পেয়ারা গাছের ডালটার সাথে নাবার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। মাটি বাসায় থাকলে নাবা মাটির সাথে কথা বলে। আর মাটি স্কুলে গেলে পেয়ারার ডালটির সাথে কথা বলে। নাবা হাসে। পেয়ারার ডালটিও বাতাসে নড়ে চড়ে ওঠে। মনে হয় সেও নাবার সাথে হাসে।

মাটির মা দোতলা থেকে নেমে গাছে পানি দেয়। গাছটির যত্ন নেয়। মাটির মা গাছের সাথে গল্প করে করে নাবাকে ভাত খাওয়ায়।

বারান্দায় ঝুলে থাকা পেয়ারার ডালে দুটি ফুল ধরে। ঠিক যেন মাটি ও নাবার মতো গলা জড়িয়ে।

ফুল দুটি দেখে মাটি আর নাবা খুব খুশি হয়। তারা নাচানাচি করে। নাবা বলে–ওয়াও, ওয়াও।

ফুল দুটি থেকে পেয়ারা ধরে। পেয়ারা বড়ো হয়।

মাটির মা বলে, তোমরা গাছের সাথে ভালো ব্যবহার করেছ। পানি দিয়েছ। কথা বলেছ। গান শুনিয়েছ। তাই সে উপহার হিসেবে তোমাদের পেয়ারা দিয়েছে।

মাটি বলে, দুটি কেন দিল? আমরা তো চারজন।

মাটির মা দূরে আঙুল দিয়ে কয়েকটা পেয়ারা দেখিয়ে দেয়।

দূরে পেয়ারাগুলো দেখে দুইবোন লাফাতে থাকে।

মাটির মা হেসে বলে, গাছ হিসাব করে কিছু দেয় না রে মা। গাছ আমাদের সব সময়ই বেশি বেশি দেয়।

ঠিকানা

বিক্রয় ও বিতরণ শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

আমার কিছু কথা আছে...

প্রিয় নবারুণ, তুমি কি বলতে পারো, পরীক্ষা নিয়ে আমার এত ভয় কেন? দিনরাত পড়ি, তবুও মনে হয় পরীক্ষার সময় কিছুই মনে রাখতে পারব না। গলা শুকিয়ে আসে। ভয়ে কখনো কখনো জ্বরও হয়। হাত ঘামে। রাতে ঘুমের ভেতর দুঃস্বপ্ন দেখি। আমার কিছু ভাল্লাগে না। নবারুণ, পরীক্ষার ভয় তাড়ানোর কোনো বুদ্ধি জানো তুমি?

[সাজিয়া ইসলাম, সপ্তম শ্রেণি, নবাবপুর সরকারি স্কুল, ঢাকা।]

নবারুণ: চুপিচুপি তোমাকে পরীক্ষার ভয় কাটানোর ১০টি বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, আর ভয় পাবে না তুমি।

১. পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করো বীরের মতো। মনে করো, কিছুই কঠিন নয়। নিজেকে উৎসাহ দাও, কেননা তুমি আসলেই পারবে। ভুলেও কোনো না বোধক চিন্তা মাথায় আনবে না।

২. একটি রুটিন তৈরি করে নাও। সারাদিন কী কী পড়বে, তার তালিকা লিখে ফেল। যা যা পড়া হয়ে যাবে, তাতে টিক চিহ্ন দাও।

৩. ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসো। টেবিলে বসে পড়তে ভালো না লাগলে বদলে ফেল পড়ার জায়গা।

৪. প্রতিদিন আট ঘন্টা ঘুমানো খুব জরুরি। বিশেষ করে পরীক্ষার সময়ে। ঠিকঠাক বিশ্রাম নিলে পড়া ভালো মনে থাকবে।

৫. পুষ্টিকর খাবার খাও। যথেষ্ট পরিমাণে পানি পান করো। চিনিযুক্ত পানীয় ও প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলো। এগুলো খামাখা রক্তচাপ বাড়াবে।

৬. বন্ধুরা কেউ কেউ খুব পড়ছে বলে গল্প দেবে। এসব কথায় কান দেবে না। নিজের রুটিন অনুযায়ী পড়তে থাকো।

৭. নিজে নিজে ঘরে যা পড়লে তার উপর নিজেই পরীক্ষা দাও। তারপর খাতা দেখে নম্বরও দাও নিজেই। তাহলে বুঝতে পারবে, কোন বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে তোমার। সে বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করো। তারপর আবার পরীক্ষা নাও নিজের। এবার যখন নাম্বার বেশি পাবে, তখন নিজের পিঠটা নিজেই চাপড়াতে হবে কিন্তু।

৮. বার বার পড়ো। তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। তবে মুখস্ত করো না খবরদার। না বুঝে মুখস্ত করলে সাহস কমে যায়, ভয় আরো বেড়ে যায়।

৯. পড়ার মাঝে ব্রেক নাও। খোলা বাতাসে এসো। লম্বা দম নাও। একটু হাসো। চাপ কমাতে ব্যায়াম কর। প্রতিদিন ৩০ মিনিট। এর ফলে পড়ায় মন দেওয়াটা সহজ হয়ে যাবে।

১০. নিচের গল্পটি পড়ো।

দোয়েলের পরীক্ষা ভীতি

অনিক শুভ

বোনপাখি দোয়েল ইদানীং খুব বেশি দুষ্টু হয়ে গেছে। ঠিকমতো পড়াশুনা করে না। সারাদিন খেলাধুলা করে আর টিভিতে নিনজা হাতুড়ি দেখে। এই নিয়ে প্রতিদিন মায়ের বকুনিও কম খায় না।

বার্ষিক পরীক্ষা দরজায় কড়া নাড়ছে। হঠাৎ পরীক্ষার আগের রাতে দোয়েলের বুক ব্যথা, বুক ধড়ফড় ও খিচুনি শুরু হলো। তাড়াতাড়ি পাশের এক পরিচিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি বললেন, রোগীর হার্ট একটু দুর্বল, এবার পরীক্ষা দেওয়ার দরকার নেই।

এরপর মোটামুটি ভালোই সময় কাটতে লাগল দোয়েলের। এখন আবার মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনাও করছে। মায়ের কথামতোও চলছে। স্কুল এবং প্রাইভেট টিচারের সব পড়া সময়মতো শেষ করে।

কিন্তু যখনই পরীক্ষার সময় নিকটবর্তী হয় তখন আবার ঐ একই ধরনের লক্ষণ। এভাবে দু'বছর কেটে গেল দোয়েলের। পরীক্ষা দিতে পারে না। বাবা-মা খুব উদ্বিগ্ন।

দোয়েলকে ভালো ডাক্তার দেখানো হলো। সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষা করানো হলো। কিন্তু কোনো রোগ ধরা পড়ছে না। আত্মীয়স্বজনদের ধারণা এটা ডাক্তারি কোনো রোগ না। তারপর শুরু হলো আরেক কুসংস্কারের পালা। কেউ বলে আছর আছে। কেউ বলে উপরি আছে। তাই চিকিৎসা বলতে এখন তাবিজ-কবজ, পানিপড়া, তেলপড়া। কিন্তু তাতেও লাভ হলো না। পরীক্ষার আগে আবার শুরু হলো সেই আগের বুক ব্যথা, বুক ধড়ফড়, খিঁচুনি ইত্যাদি।

একদিন বিকেলবেলা ছোটো মামা বাসায় এসে হাজির। সবার সাথে দেখাসাক্ষাৎ হলো। দোয়েলকে না দেখে বললেন, আমার আদরের ভাগনি দোয়েল পাখিটা কোথায়। দেখছি না যে, সবাই চুপ করে রইল। কেউ কিছু বলল না।

একসাথে সবার চুপ করে থাকাতে মামা একটু ঘাবড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, কি হয়েছে তোরা বলবি তো! না বললে তো কোনো প্রবলেমের সলিউশন বের করা যাবে না।

মা এক এক করে দোয়েলের পরীক্ষা ভীতি সম্পর্কে সব খুলে বললেন। সব শুনার পর মামা বললেন, ওহ এই ব্যাপার। এতে চিন্তার কিছু নেই। আগে দোয়েল পাখিটাকে ডাকো।

সবাই একসাথে নাস্তা করতে বসলাম। ছোটো মামার মজার মজার সব কথার সুরে এক মন মাতানো পরিবেশ সৃষ্টি হয় ডাইনিং টেবিলে। খাবার শেষে মামা বললেন, তোদের নিয়ে একসাথে তো অনেক দিন বেড়ানো হলো না। চল, আজ অনেকক্ষণ বেড়াবো। দোয়েল সাথে সাথে ইয়া....হু....বলে বলল, মামা....মামা.... আমি শিশু পার্কে যাবো।

ওকে। দোয়েল যেহেতু শিশু পার্কে যাবে বলেছে তাই আজ আমরা শিশু পার্কে যাচ্ছি।

আমি, মামা আর দোয়েল অনেক মজা করলাম শিশু পার্কে। বেশি মজা হয়েছে রোলার কোস্টার আর বাম্পার কারে। হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে গেছে। দোয়েল বলল, মামা আমি পোলার আইসক্রিম খাবো।

মামা দোয়েলকে পোলার আইসক্রিম কিনে দিলেন আর বললেন, এখন আমার দোয়েল পাখিটাকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাবো।

এই বলে মামা আমাদের নিয়ে এলেন উনার বন্ধু পিয়াল আঙ্কেলের চেম্বারে। উনি মন-বিশেষজ্ঞ। মামা দোয়েলের পরীক্ষা ভীতি নিয়ে সব পিয়াল আঙ্কেলকে বললেন।

আঙ্কেল প্রত্যেকটা কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনলেন। এরপর বললেন, দেখো, আমরা সব সময় কোনো না কোনো ভয়ভীতির সম্মুখীন হয়ে থাকি। এই যেমন– বেশি মানুষের সামনে কথা বলতে গেলে, অনেকে আবার পোকামাকড় দেখলে। অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা শিক্ষকদের সাথে কথা বলতে ভয় পায়। অফিসের অনেকে আবার বসের সাথে কথা বলতে ভয় পায়। যার ফলে চাকরি পর্যন্ত ছাড়ার উপক্রম হয়। তাই এসব ভয়ভীতির জন্য কারো শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনে ব্যাঘাত ঘটে, তখন কিন্তু মন-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

দোয়েল জানল, পরীক্ষা ভীতি একটু ভিন্নধর্মী ভয়ের নাম। এটা এক ধরনের টেনশন গ্রুপের অসুখ। যাকে আমরা ফোবিক অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার বলে থাকি।

কথাবার্তা শেষে ডাক্তার আঙ্কেল দোয়েলের জন্য কিছু ঔষধ ও বিহেভিয়ার থেরাপি দিলেন।

বাসায় এসে মামা মাকে সব বুঝানোর পর বললেন, আমাদের দোয়েলের মতো অনেকে বিভিন্ন ধরনের ভীতি নিয়ে কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ হয়ে আছে। যার ফলে ভুল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একটি মানুষের জীবনকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ধ্বংসের দিকে।

এরপর মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের প্রত্যেকের উচিত এসব ভীতির সঠিক কারণ খুঁজে বের করে সঠিক সমাধানের মাধ্যমে সকলকে সচেতন করা।

দোয়েল এখন নিয়মিত ঔষধ সেবন করে ও বিহেভিয়ার থেরাপি মেনে চলে। এর মাধ্যমে ও চরম সাহস এবং উদ্দামের সাথে পরীক্ষা দিয়ে ভালো রেজাল্টও করল। এখন আর কোনো পরীক্ষাকে ভয় পায় না ও।

লেখা ও আঁকা: কাজী তাবাসসুম আহমেদ

নীল তিতির

কৃণন মাহমুদ নিয়োগী

মিউ মিউ। আমার নাম তিতির। তিতির! এটাতো পাখির নাম। কিন্তু আমি তো পাখি না। আমি একটি বিড়াল। ছোট্ট বিড়াল। আমার বয়স আর কত হবে? দুই বছর হতে পারে।

আমরা তিন ভাইবোন। বাবাকে কখনো দেখিনি। মা-ই আমাদের যত্ন নিত। কিন্তু মা যে আর বেঁচে নেই। সেও আমার দোষ। একদিন মা আর আমরা ভাইবোন মিলে আমাদের আন্টিদের বাসায় বেড়াতে যাচ্ছিলাম। আমি আবার সবার ছোটো। সবাই রাস্তা পার হচ্ছে কিন্তু আমি বসে ছিলাম। সবাই পার হয়ে গেল। মা পেছনে তাকিয়ে দেখে আমি রাস্তার ওপারে। মা দৌড়ালো আমাকে আনার জন্য। কিন্তু আমার কাছ পর্যন্ত আসতে পারল না। ছোট্ট একটি লাল গাড়ি চলে গেল মায়ের ওপর দিয়ে। সেখানে পড়ে রইল মায়ের নিথর দেহ।

এই দৃশ্য দেখার পর আমি কাঁদতে লাগলাম। মিউ মিউ। ভাইয়া আর আপুও কাঁদতে শুরু করল। আমরা সবাই কাঁদলাম মিউ মিউ মিউ। রাস্তার অনেক মানুষ আমাদেরকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু আমাদের দিকে এগিয়ে এল না।

আমরা আমাদের বাসায় যেতে পারিনি। পাশের একটা গ্যারেজে গিয়ে উঠলাম। গ্যারেজে থাকি। এটা সেটা খেয়ে জীবন বাঁচাই।

কয়েক দিন পর একটু ধাতস্থ হলাম। ভাইয়া ও আপুর কদিন ধরে মেজাজ খারাপ। আমার কোনো যত্নই তারা নেয় না। একদিন খাওয়ার সময় মায়ের কথা মনে পড়ল। তখনই কাঁদতে শুরু করলাম। প্রথমে ভাইয়ার নজরে পড়ল। বলল, কাঁদছিস কেন?

আমি বললাম, মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে।

তখন আপু বলল, তোর জন্যই তো মা মারা গেল।

আমার জন্য?

হ্যাঁ। তোর জন্যই তো। কেন রাস্তাটাও পার হতে পারলি না?

আপুর কথা শুনে খুব মনে লাগল। বুঝলাম আমাকে তারা পছন্দ করে না। আমি নিজের খাবার খুঁজতে পারি না। তাই ভাইয়া ও আপু আমাকে মনে হয় বোঝা মনে করে।

একদিন সত্যি সত্যি ভাইয়া ও আপু আমাকে না বলে কোথায় জানি চলে গেল। তখন যেন আমার মাথায় বাজ পড়ল। সারাদিন গ্যারেজের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। খিদেয় তো পেট একেবারে শেষ। সারারাত বাসায় বসে কাঁদতে লাগলাম। সকালেও সারাক্ষণ খালি ডেকেই চললাম। ভাইয়া, আপু, তোমরা কোথায়? আমাকে নিয়ে যাও। আমি এভাবে একা থাকতে পারব না।

আমার কান্না শুনে রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি মেয়ের করুণা হয়। সে মেয়েটির বয়স ৮/৯ বছর হবে। সে তার মাকে বলল, মা, মা, দেখ কী সুন্দর ফুটফুটে বিড়ালছানা।

মেয়েটির মা বলল, হ্যাঁ। খুবই সুন্দর।

মা, আমি ওকে বাসায় নেব। প্লিজ মা, আমি ওকে নিতে চাই।

ঠিক আছে। ওর যত্ন নিতে হবে কিন্তু।

ঠিক আছে। যত্ন নেব মা।

মেয়েটি আমাকে তুলে নিল। ওর ছোট্ট হাত দুটিতে আমি খুব নিশ্চিন্তে ধরলাম। যাক, খিদেয় আমি মরব না। মেয়েটি আমাকে দেখে বলল, তুমি অনেক সুন্দর ছোট্ট বিড়ালছানা।

আমি বললাম, মিউ।

সে বলল, তুমি আমার কথা বুঝো?

আমি বললাম, মিউ।

তোমার নাম কী রাখি বলো তো?

মিউ মিউ।

না, মিউ মিউ কোনো নাম হতে পারে না।

মিউ মিউ মিউ।

আচ্ছা। তোমার নাম তিতির রাখলে কেমন হয়?
আমি কিছু বলার আগেই সে বলল, হ্যাঁ। আজ থেকে তোমার নাম তিতির।

কয়েক দিন হলো আমি মেয়েটির বাসায় থাকি। সে আমাকে খুব আদরযত্ন করে। সময়মতো খাবার দেয়। আমাকে গোসল করিয়ে দেয়। শরীর আঁচড়িয়ে দেয়। একদিন চুল আঁচড়িয়ে দিতে দিতে বলল, তিতির তুমি কী জানো তোমার গায়ের লোমগুলো নীল রঙের। বিড়ালদের মধ্যে এমন কোনো দিন দেখা যায় না। এজন্যই তুমি খুব সুন্দর! খুবই সুন্দর!

মেয়েটির কথা শুনে আমি শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখি সত্যি সত্যি আমার গায়ের লোমগুলো নীল রঙের। আমি আনন্দে মিউ মিউ করলাম। তারপর আনন্দে আমি কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম। আর মেয়েটি আমাকে আদর করল।

শুধু মেয়েটি নয়, এ বাসার সবাই আমাকে আদরযত্ন করে। আমাকে নিয়ে গল্প করে। আমাকে গল্প শোনায়। ওর মা-বাবাও খুব ভালো। ওরাও আমাকে যত্ন করে। এমনকি বাসার সবাই।

একদিন শোনা গেল যে, এবাসার গৃহপরিচারিকার চিকন গুনিয়া না কী যেন হয়েছে। আমি চিন্তা করে পাই না এত মোটা মানুষের চিকনগুনিয়া কেন হলো? কেন মোটাগুনিয়া হলো না? যাই হোক, জন্য সে আর বিছানা ছাড়ে না। সারাদিন ব্যথায় চিৎকার করে। কিন্তু কাজ তো থেমে থাকে না। তাই টুনুদের বাসায় নতুন গৃহপরিচারিকা আনা হলো।

ওহ! বলতে মনে নেই। যে মেয়েটি সেদিন আমায় বাঁচিয়েছিল তার নাম টুনু।

এখন হয়েছে কী? নতুন মেয়েটা আমাকে যেন বিষ মনে করে। আমাকে একদম সহ্য করতে পারে না। একদিন টুনু স্কুলে যায় তখন যেন আমার ওপর দিয়ে তুফান চলে। ঝাড়ু দিয়ে আমাকে পিটায়। আমিও এমন দৌড় দিই... একেবারে খাটের তলায়। মহিলা তো নাছোড়বান্দা, আমাকে তাড়াবেই। ঠিক তখনই মা বাজার থেকে আসে। আর মেয়েটা এমন ভাব করে যেন সে ফেরেশতা। সে আমাকে সব ময়লা-আবর্জনা খেতে দেয়।

আমি বুঝলাম তার অত্যাচার আর সহ্য করা সম্ভব না। তাকে জব্দ করার কথা চিন্তা করি। একদিন দেখি সে গরম পানির পাতিল নামাচ্ছে। আর আমি সেই সুযোগটা নিলাম। ওর পায়ের ওপর দিয়ে দিলাম দৌড়। সঙ্গে সঙ্গে পানি পড়ে গেল ওর গায়ের ওপর। চিৎকার করে উঠল সে। নিয়ে নিল বিদায়।

এখন আমি মেয়েটি হলেই মিউ। মাছ, মজার অনেক দিন বলে ভালোই আছি। আগের সেই আবার এসেছে। খাবার সময় তার কাছে যাই। বলি মিউ মিউ সেও আমাকে ভালো খাবার দেয়। মাংস, দুধ আরো কত মজার খাবার।

ধরে শুনছি টুনু তার মা-বাবাকে সে কক্সবাজার যাবে। তখন তারা বলে ঠিক আছে যাবো। কিন্তু কখন যাবে তা আর বলে না।

তা আমি তো কোথাও বেড়াতে যাই না। ভাবলাম এটি শহরের কোনো এক বাজার হবে যেখানে কক বিক্রি করা হয়। পরে জানলাম কক মানে মোরগ। তার মানে মোরগ বিক্রি করা হয় যে বাজারে সেখানে যাবে। হয়ত মোরগের তরকারি খেতে চায়।

টুনু

একদিন মা যখন বলল, ঠিক আছে, ছুটিতে যাব। তখন টুনু মহাখুশি। মায়ের কাছ থেকে এসে প্রথমেই আমাকে অনেক কিছু বলতে লাগল। যা বলল তার সারমর্ম এমন- জানো তিতির, আমরা না কক্সবাজার যাচ্ছি। সেটা অনেক দূরে। সেখানে সমুদ্র আছে। আমরা ট্রেনে ও পরে বাসে করে যাব। আমার সঙ্গে তুমিও যাবে। ঠিক আছে?

আমি আনন্দে বললাম, মিউ।

কিন্তু সেখানে যাওয়ার সময় তোমার গায়ে রং দিয়ে বদলিয়ে দিতে হবে। কারণ, নীল রঙের বিড়াল দেখে কেউ হয়ত তোমাকে নিয়ে যাবে।

মিউ মিউ।

তখনই বুঝলাম 'কক্সবাজার' মোরগ বিক্রির বাজার নয়। এটি একটি জায়গার নাম। যেমন, আমাদের ঢাকা। ঢাকা একটি শহরের নাম হলেও এটি কী আর কিছু দিয়ে ঢাকা আছে?

অবশেষে একদিন ছুটি শুরু হলো। টুনু আনন্দে গান গাইতে শুরু করে। হইহুল্লোর করে সারা বাড়ি অস্থির করে তুলল। টুনুর খুশি দেখে মা-বাবাও খুশি। রাতে টুনু আমার গায়ে জল রং দিয়ে সাদা করে দিল। আমিও খুশিতে বললাম, মিউ মিউ।

আজ আমরা রওনা হচ্ছি কক্সবাজার যাব বলে। টুনু অনেক কিছু সঙ্গে নিয়েছে। মনে হচ্ছে সে পৃথিবীর সব চাইতে সুখী মানুষ। ভোর ছয়টায় ট্রেন ছাড়বে। টুনু সারারাত ঘুমাতে পারে নি। ওর জ্বালায় বাসার অন্যরাও ঘুমুতে পারেনি। বাসার সবাই ভোর পাঁচটা থেকে তৈরি হলাম।

ঠিক ছয়টায় ট্রেন ছাড়ল। প্রথমে আস্তে আস্তে। কিছুক্ষণ পর গতি বাড়তে লাগল। অনেক বেগে যেতে শুরু করল। ঝিকঝিক ঝকঝক করে কথা বলাও শুরু করল। আমি একবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম দূরের মাঠ। বাহ! কী সুন্দর! মাঠ, গাছগাছালি। গ্রামগুলো যেন ঘুরপাক খেতে লাগল। মনে হলো মাঠঘাট পিছনের দিকে যাচ্ছে আর আমরা একই জায়গায় বসে আছি। ট্রেনের গতির সাথে যেন বাতাসও পাল্লা দিতে পারল না।

আমরা গাড়ির যে বগিতে উঠেছি সেটি বেশ বড়ো। টুনু একবার সিট ছেড়ে বাইরে যেতে চাইল। মা একবার নিষেধ করলেও পরে আবার যেতে বলল। টুনু দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। এই সময় দুটি একটি লোক আমার পাশে দাঁড়ালো। লোকটি ভয়ঙ্কর মনে হলো। আমি মিউ মিউ মিউ করে চিৎকার করলে টুনুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে বলল, চুপ করো। এত চেঁচামেচি কীসের?

আমি ধমক খেয়ে দমে গেলাম।

এই সময় লোকটি টুনুর মাথায় পিস্তল ধরল। তার পিছনেই দুজন পুলিশ। আসলে পুলিশ এই লোকটিকে ধরার জন্য ধাওয়া করছিল। তখন টুনুকে জিম্মি করে ডাকাতটি টুনুর মাথায় পিস্তল ধরে পুলিশকে বলল, খবরদার, কাছে আসবে না। কাছে আসলে এর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।

পুলিশ কী করবে বুঝতে পারছে না। টুনু ভয়ে কাঁপতে লাগল আর কাঁদতে শুরু করেছে। ট্রেনের ভিতর মানুষেরা মনে হয় দমবন্ধ হয়ে মারা যাবো। অনেকের চোখ ভিজে সারা।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সবকিছু পালটে গেল। আমি আস্তে আস্তে গিয়ে ডাকাতটির পায়ে এমন কামড় দিলাম যে, ডাকাতটি লাফ দিয়ে পড়ল আর হাতের পিস্তল পড়ে গেল নিচে। টুনুও এই সুযোগে দূরে সরে গেল। এক দৌড়ে মায়ের কাছে। ডাকাতটি পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার পা তো এখন অচল, পালাবে কী করে? পুলিশ লোকটিকে ধরে ফেলল।

টুনু তখন আমাকে কোলে নিয়ে আদর করল। বলল, অনেক ধন্যবাদ তিতির। তুমি আজ আমাকে বাঁচালে। মা-বাবাও আমাকে আদর করল। ঘটনাটি মুহূর্তে আমাদের ট্রেনের বগিতে জানাজানি হয়ে গেলে অনেকেই আমাকে দেখার জন্য উঁকি মারল। অনেকেই টুনুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখল। কেউ কেউ বলল, একটা বিড়ালের কী বুদ্ধি দেখো। আমার শুনতে ভালোই লাগছিল। মনে মনে খুশিও হচ্ছিলাম।

পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে মা টুনুকে বেশ করে ঝালাই করল, আগেই বলেছিলাম, সিট ছেড়ে যেও না। তবু গেলে। এখন তিতির না থাকলে কী হতো আমি লক্ষ করলাম মায়ের চোখে পানি।

একটু পরেই আমাদের পাশের সিটের একটা লোক আমাকে বার বার দেখছে। লোকটা যে মতলববাজ আমার সন্দেহ হলো। আমিও সাবধান হয়ে গেলাম।

আমরা চট্টগ্রাম স্টেশনে নেমে পরে আবার বাসে চড়লাম।

অবশেষে বিকেলে এসে পৌঁছলাম একটি রিসোর্টে। খুব সুন্দর রিসোর্ট। রিসোর্ট তো নয় যেন রাজপ্রাসাদ। টুনুও মহাখুশি। রিসোর্টের নাম রোজভিউ। এখানে সাত দিন থাকব। রুম নম্বর কত? মনে রাখা দরকার, যদি হারিয়ে যাই তাহলে যেন খুঁজে বের করতে পারি। তাছাড়া আমার ঘ্রাণশক্তিও প্রখর। হারালেও খুঁজে নিতে সমস্যা হবে না।

পথে খাওয়া দাওয়া ভালোই হয়েছে। এখন আর কারোই খিদে নেই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আমরা সবাই ঘুরতে বের হলাম। সারাদিন বেশ রোদ ছিল। কিন্তু এখন আকাশ কালো মনে হচ্ছে। মেঘ জমেছে বেশ। এখন আকাশ নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই।

সন্ধ্যার একটু আগে আমরা গেলাম সেই টুনুর মুখে শোনা সি-বিচে। সেখানে গিয়ে আমার চক্ষু

চড়কগাছ। এতো সুন্দর জায়গা আমি আমার ২ বছর ২ মাস ৯ ঘন্টা ১৩ মিনিটের বয়সে দেখিনি। সমুদ্রের ঢেউ, এত বড়ো সৈকত, ঝাউগাছ সব মিলিয়ে সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি।

আমি আর টুনু বালু নিয়ে খেলছি। একটু পর টুনু সমুদ্রের পানিতে নামল। আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম। পানিকে আমার খুব ভয়। পানিতে নামতে আমার সাহসে কুলোয়নি।

দু' দিন ভালোই কাটল।

তৃতীয় দিন তখনো সন্ধ্যা হয়নি। কিছু সময় বাকি আছে। হঠাৎ আকাশ খুব কালো হয়ে গেল। একটি মাইক থেকে ঘোষণা আসছে, সবাই তাড়াতাড়ি সি-বিচ ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যান। দৌড়ান। টুনু হয়ত ভয়ে আমার কথা ভুলেই গেছে।

মুহূর্তেই প্রবল ঝড় শুরু হলো। আমার চোখে কিছু বালু পড়াতে আমি আর কিছু দেখতে পাই নি। হায়! আমার এখন কী হবে? আমি কোথায় যাব? এমন চিন্তা করার সময়টুকুও পাইনি। একবার বুঝতে পারলাম একটা দমকা বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে? কোথায় যাচ্ছি? আমি কী সমুদ্রে ডুবে মরব? বাতাস আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

তুমুল বৃষ্টিও শুরু হলো।

অনেকক্ষণ পর আমি বুঝতে পারলাম আমি একটা ঝাউগাছের মগডালে বসে আছি। কীভাবে কী হলো বুঝতে পারিনি। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি মানুষ নেই। একটু পরে বুঝতে পারলাম দু'একজন মানুষ টর্চ লাইট নিয়ে কী যেন খুঁজছে।

আমি ঝাউগাছ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়লাম। পায়ে পেলাম বেশ চোট।

আমি চোখ খুলতে পারছি না। চোখে মনে হয় বালুর ট্রাক। বৃষ্টিতে আমার গায়ের রং মুছে যাওয়াতে আমার অরিজিনাল রং মানে নীল রংটি ফিরে পেয়েছি। আর এটিই হলো আমার কাল। টুনু যা সন্দেহ করেছিল তাই হয়েছে। একটি লোক আমাকে ধরে বস্তায় ভরে নিয়ে চলল। লোকটি বলল, এই বিড়ালটি অনেক বুদ্ধিমান। ট্রেনে যে খেলাটা দেখাল তা জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার মতো ঘটনা। এর অনেক দাম হবে। অস্ট্রেলিয়াতে প্রদর্শনীতে হাজির করব। প্রথম পুরস্কারটা পাবই। এমন বড়ো আর নীল রঙের বিড়াল পৃথিবীতে দুটি নেই। তারপর বিক্রি করব এক লাখ ডলারে। লোকটির সঙ্গে থাকা অন্য দুজন শুধু হু, হা করল। তারা হয়ত এই বিষয়ে তেমন কিছুই জানে না।

আমি বুঝে গেলাম আমার দিন শেষ। টুনুকে আর দেখা হবে না। বাংলাদেশেও আর থাকা হবে না। হয়ত অস্ট্রেলিয়াতে কারো কাছে আমাকে বিক্রি করে দেবে।

তবু আশা ছাড়িনি। ভাবছি ধৈর্য ধরে কিছু করতে হবে। মুশকিল হলো চোখ খুলতে পারছি না।

তবে সুখের বিষয় হলো লোকটি আমাকে নিয়ে পশু হাসপাতালে নিয়ে গেল চিকিৎসার জন্য। ডাক্তারের কথায় বস্তা থেকে খাঁচায় রাখা হলো। প্রথমে আমার চোখের বালি পরিষ্কার করা হলো। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। সব দেখতে পাচ্ছি।

তারপর পায়ের ব্যথাটার জন্যও ওষুধ দেওয়া হলো এবং রাতে আমাকে একটা রুমে আটকে রাখল। হাসপাতালের লোকগুলোর হয়ত জানালা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। আর ওদের ভুলের ফলে আমার পালানোর সুযোগ হলো।

আমি টুপ করে তৈরি হয়ে গেলাম। জানালার পাশে গিয়ে লাফ দেওয়ার সময় আমার লেজ লেগে একটা কাচের গ্লাস পড়ে গেল। শব্দ হলো। ভেঙেও গেল। এই শব্দ পেয়ে লোকটি আমার ঘাড় চেপে ধরল। সে বলল, 'না, না, তোমাকে পালাতে দেবো না। কী ভেবেছ? পালিয়ে যাবে? এত সহজ! হুম।'

আমি শুধু ছটফট করলাম কিছুক্ষণ। খুব ভালো করে

তাকিয়ে দেখলাম, যে লোকটা ট্রেনে আমাদের সিটের পাশে বসেছিল এটি সেই লোক। আমার বুঝতে আর বাকি রইল না, এই লোক আগে থেকেই আমাকে ধরার জন্য মতলবে আছে।

এক সময় আমি বুঝতে পারলাম লোকটি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আর এই সুযোগে আমি ওর মুখ খামচে দিলাম। একটা আর্ত চিৎকার শুনলাম।

এই তো সুযোগ! জানালা দিয়ে লাফ মেরে অন্ধকারে ঝোঁপের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম।

ক্লান্ত হয়ে দাঁড়ালাম ঝোঁপের আড়ালে।

সেই লোকটি আবার। একদম শুকনো ও লম্বা। ঠিক যেন কাঠি। এই লোকটিই ট্রেন থেকে আমার পিছু নিয়েছে।

অন্যজন তার পুরো উলটো। কালো। মোটা। মনে হয় ঘাড় নেই। শরীরের ওপর মাথাটা বসানো।

শুকনো কাঠি বলছিল, বুঝেছিস কালা, বিড়ালটার একটা পা ভাঙা।"

কালা বলল, হুম বুঝলাম।

তার মানে কী বল তো?

এ্যাঁ, এর মানে কী হতে পারে?

ধুর, গাধা! এর মানে বেড়ালটা আশপাশে আছে।

ও। আশপাশেই আছে।

এখন হাবার মতো তাকিয়ে না থেকে খোঁজাখুঁজি কর।

হায়! এখন কী হবে? কালা এদিকে এগিয়ে আসছে। আমাকে ধরে ফেলল প্রায়। এমন সময় কাঠি বলল, ধুর! তোর মাথায় কী কিছু আছে?

ক্যান, বল তো।

আরে গাধা, বিড়াল কী এতো চালাক যে, ঝোপের আড়ালে লুকাবে। তুই আশপাশে খোঁজ।

হুম। মানুষও না। বুঝে যাই আমিও তিতির। তোদের চেয়ে আমিই বেশি চালাক। শায়েস্তা করতে হবে তোদের। ঢং শুরু করেছে। একটা বেড়াল কত ভয়ংকর হতে পারে দেখিয়ে দেবো। হুম।

আমি কালার সামনে গেলাম। তবু সে আমাকে দেখে না। বললাম, মিউ।

তখন কালা দেখল আমাকে। আমি দৌড় লাগালাম। কালাও আমার পিছে পিছে দৌড়াতে লাগল। আমিও প্রাণপনে ছুটছি। পায়ের ব্যথা অনেকটা কমে গেছে। ছুটতে ছুটতে একটা নারকেল গাছের সামনে এলাম। আমার পিছনে কালা। আমাকে ধরতে যাবে কেবল, এমন সময় দিলাম এক লাফ।

ঠাস!! মাথায় বাড়ি খেল কালা। পাঁচ কেজি ওজনের ডাব পড়ল গাছ থেকে।

শব্দ শুনে কাঠিও চলে এল। দেখল তার সাথি চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে। ভাবল, এখানে ভূত আছে নাকি। কালা এভাবে পড়ে গেল কেন? এত বড়ো মানুষটাকে

অজ্ঞান...। আর এই কথা ভেবেই কী যে দৌড় দিল না!

কখন যে সকাল হলো টের পাইনি। এখানে সব চেনা চেনা লাগছে। আরে! এই তো রিসোর্ট রোজ ভিউ।

হ্যাঁ, তাহলে চলে এসেছি।

একি টুনু কোথায় গেল? হায়, ওরা কি চলে গেছে?

মিউ মিউ। টুনু। আমাকে নিয়ে যাও।

না। টুনুর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

ভাবলাম, না। হার মানা যাবে না। আমাকে ঢাকায় যেতেই হবে। একটু আড়ালে গিয়ে চিন্তা করে ঠিক করি কীভাবে যাব।

আমি ঘ্রাণ নিয়ে বুঝতে পারছি কীভাবে আমাকে যেতে হবে। মানুষ তো জানে না কুকুর বিড়ালের ঘ্রাণশক্তি কত প্রখর। এরকম ভাবনা থেকেই আমি সরাসরি রাস্তা দিয়ে না গিয়ে আড়ালে আবডালে ধীরে ধীরে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সরাসরি রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মানুষ আমাকে কোনো মতেই ছাড়বে না।

এক সময় মনে হলো আমি ঢাকার বাসের কাছাকাছি আছি। এসব বাস ঢাকা থেকে আসে। একটা লোকও চিৎকার করে বলছে, ঢাকা ঢাকা ঢাকা।

আমি আড়াল থেকে ভাবছি, বাসে কীভাবে উঠব। এতো সহজ নয় যে আমি উঠলেই চলে যেতে পারব। প্রথমে কিছু বোকা লোক আমাকে দেখে চিৎকার করবে। কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। আর বেশি চালাকগুলো আমাকে নিয়ে যেতে চাইবে। আর যদি কাঠি আমাকে দেখে তখন তাহলে তো আমাকে অস্ট্রেলিয়াতে নিয়েই যাবে। পৃথিবীর সেরা বিড়ালের পুরস্কার পাবে। বিক্রিও করে দিতে পারে অনেক দামে।

আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ঢাকার বাসের খোঁজ পেয়ে বাসের তলে বসে রইলাম। ভাবলাম, মালপত্র যেখানে তোলে সেখানে সবার চোখের আড়ালে ঢুকে যাব। কিন্তু হঠাৎ কী হলো? সেই কাঠি লোকটি আমাকে দেখে ফেলে আর পিছন দিক থেকে ধরে আমাকে একটি কার্টনে ঢুকিয়ে ফেলে। কার্টনটি বন্ধ করে দেয়।

কার্টনটি আবার রেখে দিল লাগেজ বক্সে। আমিও চিন্তা ভাবনা করছি কীভাবে এখান থেকে মুক্তি পাব। বাস চলছে যেন রকেটের গতিতে। ট্রেনে বসে যেমন দেখছিল চারদিকের গাছপালা পিছনে পড়ে যাচ্ছে। এরপর বিস্তৃত মাঠ, যে মাঠ আকাশ ছুঁয়ে গেছে সেই মাঠ আর দেখতে পাচ্ছি না। আমি অন্ধকারে একটি কার্টনে বন্দি হয়ে রইলাম।

বাপরে! কী ঝাঁকিটাই না খেলাম মাত্র। আরেকটি হলেই তো মনে হয় বাসটি উল্টে যেত। কী হত তখন? আবার পা ভাঙত বুঝি। যাক, খুব ঘুম পাচ্ছে। একটু ঘুমাব নাকি? না, ঘুমালে চলবে না। আমাকে বাঁচতে হবে। আমি বুদ্ধি করে কার্টনটি আস্তে আস্তে দাঁত দিয়ে কাটতে শুরু করলাম।

সব অন্ধকার। কোথায় যাচ্ছি কে জানে। তবু সাহস করে কার্টন কাটছি। আস্তে আস্তে কাটতে কাটতে একটু ফাঁক তৈরি করলাম। আমি কার্টন থেকে বের হয়ে অন্য একটি বড়ো ব্যাগের পিছনে লুকিয়ে রইলাম।

সব অন্ধকার। কোথায় এসে গাড়িটা থামল। বাইরে আবার কথা হচ্ছে।

সর্বনাশ! এখান থেকে পালাতেই হবে। কিন্তু কীভাবে পালাব। আমি ভাবতে লাগলাম। আর তখনই বাসটি আবার চলতে লাগল।

এক সময় বাসের লোকজন বলাবলি করছে ঢাকায় চলে এসেছি।

গাড়ি থামল। লাগেজ বক্স খোলা হলো। আর লোকজন ট্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর এই ফাঁকে আমি বের হয়েই দৌড়ে একটা গর্তে লুকিয়ে গেলাম। তখনও কাঠি আর কালা হয়ত গাড়ি থেকে নামেই নি। সুযোগটা বেশ কাজে লাগল।

অনেকক্ষণ পর দেখি কাঠি আর কালা দূরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ওদের কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না।

আর আমি এই ফাঁকে আরেকটা ভালো জায়গায় লুকিয়ে গেলাম। অনেক রাত। চারদিকে অন্ধকার। ঢাকায় লোড শেডিং শুরু হলো। আর বিড়ালের লোড শেডিং কী? আমি অন্ধকার আলোতে সমানভাবেই দেখতে পারি। ছুটলাম। গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমি টুনুদের বাসায় যেতে শুরু করলাম। অন্ধকার থাকাতে সুবিধে হলো যে, মানুষ বুঝতে পারে নি আমার গায়ের নীল না কালো।

আমি দৌড়াতে দৌড়াতে টুনুদের বাসায় ফিরে এলাম।

আমাকে দেখে টুনুদের বাসায় যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। টুনু আমাকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ আদর করল, আর বলল, কীভাবে সম্ভব হলো? কীভাবে সম্ভব হলো? কী করে এলে রে তিতির!

আমি বললাম, মিউ মিউ মিউ।

সপ্তম শ্রেণি, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

সাজিদ

এক স্বপ্নবাজ ক্রিকেটার

মাসুমা রুমা

একদিন রাতেরবেলা আমি তখন ঘুমিয়ে, হঠাৎ মানুষের কথাবার্তায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মুছতে মুছতে ঘরের বাইরে বের হয়ে এলাম। জানতে চাইলাম, এত রাতে সবাই কী করছে। কেউ আমাকে সত্যি কথা বলল না। আমাকে তারা জোর করে ঘরে পাঠিয়ে দিল। আমি আবারো ঘুমিয়ে গেলাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুনি, আমার একটা ভাই হয়েছে। আমি তখন মহাখুশি! আঁতুড়ঘরে গিয়ে দেখি, পিচ্চি একটা বাচ্চা আম্মার পাশে ঘুমিয়ে আছে। আকারে অনেক ছোটো বাচ্চাটা! দেখতে খুব সুন্দর! এভাবেই পৃথিবীতে পথচলার শুরু হলো আমার স্নেহের ছোটো ভাই সাজিদ হোসেনের, একজন স্বপ্নবাজ ক্রিকেটারের।

দেখতে দেখতে ছেলেটা অনেক বড়ো হয়ে গেল। একদিন স্কুলেও ভর্তি হলো। এত ছোটো শিশু কী করে পড়া মনে রাখবে, ভাবতেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। জীবনের প্রথম পরীক্ষার সাজেশন সে হাতে পেল। আমি ভীষণ অবাক হলাম সেদিন। কারণ একটা পড়াও তাকে বুঝিয়ে দিতে হলো না। সবকিছু গরগর করে বলে গেল, লিখে গেল ছেলেটা। সেদিনই আমি বুঝে গেলাম, এ ছেলে দারুণ মেধাবী হবে!

ছেলেবেলা থেকেই সাজিদের ভেতর আমরা সবাই ক্রিকেটের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা খেয়াল করলাম। সেই ভালোবাসা দিন দিন গাঢ় হতে শুরু করল। ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতেও বল করত, পড়তে পড়তেও বল করত। টেলিভিশনে ক্রিকেট ছাড়া আর কোনো অনুষ্ঠান সে দেখে না। মাঝে মধ্যে অবশ্য কার্টুন দেখে। তার জন্য আমরা টেলিভিশনে কোনো অনুষ্ঠানই দেখতে পাই না। এই সামান্য ত্যাগটুকু আমরা হাসি মুখেই করে যাচ্ছি সাজিদের জন্য। সাজিদের স্মৃতিশক্তি অনেক প্রখর। বিশ্বের সব ক্রিকেট দলের সকল খেলোয়াড়ের নাম তার নখদর্পণে। প্রায় অধিকাংশ ক্রিকেট ম্যাচ সে ইতোমধ্যে দেখে ফেলেছে। খেলা দেখেই সে বলে দিতে পারে, কে সর্বোচ্চ রান করেছিল সে ম্যাচে।

পড়াশুনাতে সাজিদ অনেক ভালো। এখন সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। সব ক্লাসেই প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিও পেয়েছে। খুব সহজেই যে-কোনো পড়া বুঝে যায়। তার পেছনে আমার কিংবা আম্মার তেমন কষ্টই করতে হয়নি। খাবার-দাবারের বিষয়ে সে অনেক মানিয়ে চলতে পারে। আম্মা যখন যা রান্না করেন, চুপচাপ তাই খেয়ে নেয় সে। মনে কোনো অসন্তোষ নেই তার। তাকে নিয়ে আমাদের কখনো কোনো বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি। কারো নতুন পোশাক, খেলনা বা খাবার দেখে তাকে আবদার করতে দেখিনি। অবশ্য আম্মা আমাদের তিন ভাইবোনকে ছেলেবেলা থেকে সেভাবেই গড়ে তুলেছেন। বাইরের খাবার সে খুব একটা পছন্দ করে না। আম্মার হাতের রান্না করা খাবারই তার পছন্দ। শিশুকাল থেকেই খুব ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের। কারো সঙ্গে কখনো মারামারি বা ঝগড়া করতে দেখিনি। স্বভাবসুলভ মাঝে মধ্যে দুষ্টুমি করত শুধু। অধিক পোশাকের প্রতি তেমন আকাঙ্ক্ষাও

নেই। তবে ক্রিকেট খেলার সরঞ্জামগুলোর প্রতি তার অন্যরকম দুর্বলতা কাজ করে।

২০১৬ সালে বিসিবি আয়োজিত জেলা অনূর্ধ্ব-১২ তে সাজিদ সেরা ব্যাটসম্যানের খেতাব পায়। পুরস্কার হিসেবে অর্জন করে সাকিব আল হাসানের স্বাক্ষরিত মেডেল আর ক্যাপ। পরবর্তীতে জেলা অনূর্ধ্ব-১৪ অংশগ্রহণ করে। সগৌরবে সিলেক্টেডও হয়।

সাজিদ বিশ্বসেরা ক্রিকেটার হতে চায়। ক্রিকেটের প্রতি তার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা আমাদের মুগ্ধ করে। হৃদয়ে লালন করা স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য সে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে চলেছে। মাঝে মধ্যে আম্মাকে জড়িয়ে ধরে সাজিদ বলে- 'আম্মা, তুমি দোয়া কর। আল্লাহ যেন আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্নটা পূরণ করে।' আম্মার চোখ দিয়ে তখন অনর্গল পানি ঝরে পড়ে। কেননা আম্মাও তখন বুঝে যায় তার সন্তানের স্বপ্নটা কত জোরালো!

আমরা বাড়ির সবাই আমাদের সবটুকু দিয়ে সাজিদকে সহযোগিতা করি। সাধ্য অনুযায়ী খেলার সরঞ্জামগুলো কিনে দেই। রোজ ভোরবেলা ক্রিকেট অনুশীলন করতে সে সদরের স্টেডিয়ামে যায়। কাঁধে থাকে একগাদা ক্রিকেট সরঞ্জাম। বিকেলবেলা অবসরে সে নিজে নিজেই বাড়িতে ক্রিকেট অনুশীলন করে। অনুশীলনে তাকে সহযোগিতা করার মতো সমবয়সি কেউ আশপাশে নেই। এটা তারজন্য কিছুটা অসুবিধার কারণ। গ্রামের খেলার মাঠে এখন আর কেউ বিকেলবেলা খেলাধুলা করে না। ছেলেমেয়েরা নিয়মিত খেলাধুলা করলে, সাজিদের জন্য ক্রিকেট অনুশীলন করা আরো সহজতর হতো। তার মানসিক সজীবতাও বৃদ্ধি পেত। ছোটো হয়েও সে বড়োদের দলে ক্রিকেট খেলার ডাক পায়। প্রায় সব ম্যাচেই সে ভালো রান করে, উইকেটও পায় নিয়মিত। গ্রামে ক্রিকেটার হিসেবে সে বেশ জনপ্রিয়। আমি ঢাকা থেকে বাড়িতে আসার সময় বেশিরভাগ সময়ই ক্রিকেট জার্সি কিনে আনি। এগুলো পেয়ে সাজিদ খুবই খুশি হয়। খুব অল্পতেই সন্তুষ্ট ছেলেটা!

ছোটদের কাছে বড়োদের অনেক কিছু শেখার আছে। আমি নিজেও সাজিদের কাছে প্রতিনিয়ত অনেক কিছু শিখছি। স্বপ্নের প্রতি তার দৃঢ় মনোবল আর পরিশ্রমী মানসিকতা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে, মনে সাহস জোগায়। একদিন পরিবারের সবাই মিলে গল্প করার সময়, আমি তাকে বললাম, যদি আমার পাখির মতো ডানা থাকত, আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আর দার্শনিকদের সঙ্গে দেখা করতাম। যারা মারা গেছেন তাদের কবর দেখে আসতাম। তুই কী করতি ভাই? সাজিদ বলল, আমি পৃথিবীর সেরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা করে আসতাম, শিখে আসতাম ভালো ক্রিকেট খেলার কায়দাগুলো। সাজিদের চোখ চলন বলন শরীরী ভঙ্গি দেখে মনে হয়, এ ছেলে ক্রিকেটার হতেই জন্ম নিয়েছে পৃথিবীতে। তাকে অন্য কিছু হতে চাপ প্রয়োগ করলে তার সঙ্গে নির্ঘাত অন্যায় করা হবে, একটি উজ্জ্বল প্রতিভাকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

আমি তার থেকে জেনেছি, কীভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়, কীভাবে অলসতা ত্যাগ করে শ্রম আর মেধা দিয়ে স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। শুধু আমার নয় আমার পরিবার শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিশ্বাস, সাজিদ একদিন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ক্রিকেটার হয়ে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। মমতাময়ী মায়ের হাতে রত্নগর্ভার খেতাবও তুলে দেবে একদিন।

সারাদিন

হাফিজ উদ্দীন আহমদ

ভোর বেলা উঠো সবে
হাঁটো এক ঘণ্টা
সারা দিন ভালো করে
তরতাজা মনটা
সাঁঝ রাতে খাওয়া ভালো
সাথে সাথে ঘুম নয়
তাই বলে রাত জেগে
থাকতে কি কেউ কয়?
বিকালেতে খেলবে
দৌড় ঝাঁপ খেলা সব
পড়তে বসে ভায়া
করতে না কলরব।

খাগড়াছড়ি ও সাজেক ভ্রমণ

সামিয়া হোসেন

আমি সামিয়া। আমি ঢাকায় থাকি। আমি আলফ্রেন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি। আমার বাবা-মা এবং বাবার বন্ধু ও তাদের পরিবারের সাথে খাগড়াছড়ি বেড়াতে গিয়েছি।

খাগড়াছড়ি খুব সুন্দর জায়গা। প্রথমে আমরা হাজাছড়া ঝরনা দেখতে যাই। আমার দেখা খাগড়াছড়িতে এটি সবচেয়ে বড়ো এবং সুন্দর ঝরনা। হাজাছড়া ঝরনা দেখার পর আমরা রওনা হলাম রুইলুই পাড়া, সাজেকের উদ্দেশ্যে।

রুইলুই পাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট উঁচু। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুব সুন্দর পাহাড়ি গ্রাম। সেখানে রাজার (হেড ম্যান) কন্যা মিস হেলেনের সাথে দেখা হয়। মিস হেলেন উচ্চ শিক্ষিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিস্টি-তে মাস্টার্স পাস করা। তিনি খুব বন্ধুভাবাপন্ন। অবিশ্বাস্য যে, তিনি তার নিজের এবং পরিবারের সব কাজ করেন। মিস হেলেনের মাধ্যমে সেখানে কাঠ দ্বারা নির্মিত খুব সুন্দর একটি কটেজে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে খুব সুন্দর সারি সারি পাহাড়ি দৃশ্য দেখা যায়। কখনো কখনো পাহাড়গুলো মেঘে ঢেকে যায়, এই দৃশ্য খুব সুন্দর- যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া করি। ভাত, সবজি, বাঁশ সবজি, বিশেষত বাঁশের ভিতর রান্না করা খুব সুস্বাদু মুরগি ইত্যাদি দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করি।

রাতেরবেলা স্পেশাল বারবিকিউ করা হয় আমাদের জন্য। আমাদের কটেজের কাছে রাজার ছোটো মেয়ে কর্তৃক পরিচালিত একটি কফি হাউজ আছে, নাম DAWR। সেখানে আমরা কফি পান করি। সেখানে আমি এবং আমার ছোটো বোন সাবা একটি কুকুর ও একটি বিড়াল দেখতে পাই। কুকুরটির নাম পিংকি আর বিড়ালটির নাম জরি। আমরা পিংকি ও জরির সাথে অনেকক্ষণ খেলা করে সময় কাটালাম।

তারপর আমরা হেলিপ্যাডে বিজিবি কর্তৃক নির্মিত রুনময় রিসোর্টে যাই। সেখানে আমরা সূর্য ঘড়ি ও চারপাশের সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করি।

দ্বিতীয় দিন, সকালে আমরা মিস হেলেনের মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে পাহাড়ি পোশাক পড়ে আমি ও সাবা অনেক ছবি তুলেছি। একটি পাহাড়ি গ্রাম কংলাক পাড়ায় যাই। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২০০০ ফুট উঁচুতে।

তৃতীয় দিন, আমরা সাজেক থেকে খাগড়াছড়ি হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে খাগড়াছড়িতে আলুটিলা গুহা ও রিসাং ঝরনা দেখতে যাই। আলুটিলা গুহা রোমাঞ্চকর এবং ভয়ংকর হাঁটার পথ। গুহার পথে পানি ও পাথরে ভরা। আমরা অগ্নি মশাল নিয়ে গুহায় প্রবেশ করেছিলাম।

রিসাং ঝরণা প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর কিন্তু মানুষের ফেলে আসা ময়লা আবর্জনার দ্বারা নোংরা। এই ঝরনায় পৌঁছাতে ২৫০ সিঁড়ি নিচে নেমেছিলাম। উঠার সময় অনেক কষ্ট হয়েছিল। এই ঝরনাটি হাজাছড়া থেকে সুন্দর মনে হয়নি আমার কাছে।

আমার প্রথম খাগড়াছড়ি ও সাজেক ভ্রমণ খুবই আনন্দময় ছিল। আমি খাগড়াছড়ি থেকে চলে এসেছি কিন্তু স্মৃতিতে এখনো আমার মন ভাসছে।

চতুর্থ শ্রেণি, আলফ্রেড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ধনিয়া, ঢাকা।

গারোদের অন্যতম উৎসব 'রোংচুগালা'

মাহফুজা হিলালী

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মধ্যে গারো একটি সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের আদি ধর্ম হলো সাংসারেক। অবশ্য এখন বেশিরভাগ গারোরা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এমন অনেক পরিবার আছে, যাদের মা-বাবা সাংসারেক এবং সন্তানরা খ্রিষ্টান। তবে এতে তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ হয় না। কারণ গারোরা সংঘবদ্ধ জাতি। তারা শুধু নিজের পরিবারেই নয় গ্রামের সবাই মিলেমিশে এক হয়ে থাকে। এটা তাদের একটা বৈশিষ্ট্য।

সাংসারেক ধর্মে প্রকৃতিকে পূজা করা হয়। এই ধর্মের একটি উৎসব রোংচুগালা উৎসব। জুম ক্ষেতের ধান কাটার আগে এই উৎসব পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো সারা বছরের যত অমঙ্গল, অকল্যাণ, হিংসা-দ্বেষ, মনোমালিন্য এবং পাপ জমা হয়েছে তা থেকে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ পাপমুক্ত হয়ে তারপর তারা নতুন ফসল বাড়িতে তোলে। এ উৎসবের আরেকটি দিক হলো তারা যেহেতু মাটিকে কষ্ট দিয়ে ফসল চাষ করে, তাই তারা মাটির কাছেও ক্ষমা চায়। রোংচুগালা উৎসব পালনের আগে জুম ক্ষেতের কোনো কিছু খাওয়া বা ব্যবহার করা এক কথায় ভোগ করা একেবারে নিষেধ। এই উৎসব সাধারণত আগস্ট মাসে উদ্‌যাপন করা হয়, কখনো কখনো সেপ্টেম্বর মাসেও হয়। 'রোংচু' শব্দের অর্থ হলো 'চিড়া' আর 'গালা' শব্দের অর্থ হলো 'ফেলে দেওয়া'। 'রোংচু' শব্দের আরেকটি অর্থ চালের খুদ। উৎসবের শুরুতেই গারোরা জুম ক্ষেতের অল্প একটু জায়গা পরিষ্কার করে অথবা গ্রামের প্রধান ব্যক্তির (নকমা'র) বাড়িতে দেবতার উদ্দেশ্যে বেদি তৈরি করে । এখানে কলাপাতা বিছিয়ে কিছু চিড়া অথবা খুদ, আখ, লেবু দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। এরপর প্রতিটি সাংসারেক বাড়িতে একের পর এক উৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন সকাল থেকে শুরু হয় উৎসব। গ্রামে যারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন, যারা গান এবং

মন্ত্র পড়েন, যারা ঢাল-তলোয়ার খেলা দেখান তারা সবাই মিলে একটি দল গঠন করে। সেই দলটি প্রতিটি বাড়িতে যান। যখন যে বাড়িতে উৎসব হয় তখন গ্রামের প্রায় সবাই সে বাড়িতে অবস্থান করে। অনেকটা সময় ধরে বাদ্য বাজানো, গান বা মন্ত্র পাঠ হয়। একজন একজন করে উঠে ঢাল আর তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের নানা ভঙ্গি প্রদর্শন করে। এ ঢাল-তলোয়ারও প্রতীকী; কখনো কখনো চ্যালা কাঠকে ঢাল-তলোয়ার বানানো হয়। ঢাল-তলোয়ার নিয়ে এই নিয়মটা দুজন বা চারজন করে। উৎসবে পানাহার হয়। প্রধান খাদ্য 'চু'। 'চু' ভাতের তৈরি এক রকম মদ। 'চু'এর সাথে থাকে খাড়ি, চুচুরু এবং গোপ্পা। চুচুরু হলো শামুক রান্না, আর গোপ্পা হলো মুরগির মাংস সোডা দিয়ে রান্না এক রকমের খাবার। এছাড়া মিদাব সান্দাব, বাতাবি লেবু মাখানো, কানামাছি মাখানোও খাদ্য তালিকায় থাকে মাঝে মাঝে। 'চু' বা অন্য খাবার তারা প্রথমে মাটিকে খেতে দেয় অর্থাৎ মাটিতে একটু ফেলে, তারপর অতিথিকে দেয় এবং শেষে নিজে খায়। এ উৎসবে কোনো নাচ করা হয় না। নাচ করলে অমঙ্গল হবে বলে তারা আশঙ্কা করে। প্রতিটি বাড়িতে ক্রমান্বয়ে উৎসব করতে ২/৩ দিনও লাগে। রাতের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎসব চলে। এ উৎসবে শিশুরা খুব একটা অংশ নেয় না। কারণ এটা মূলত মন্ত্রপাঠ এবং পবিত্রকরণ উৎসব, এ বিষয়গুলো শিশুদের জন্য আনন্দকর নয়। তাই তারা যার যার বাড়িতেই থাকে। বাড়ির নকমার তত্ত্বাবধানে শিশুদের রেখে অন্যরা উৎসব বাড়িতে যায়। তবে নিয়ম হলো প্রথমে শিশুদের খাইয়ে তারপর বড়োরা তাদের উৎসবে যাবে। অবশ্য দু/এক বাড়িতে শিশুরা নিজেদের খুশিমতো যেতে পারে। এতে কোনো নিয়মের বাধা নেই। সবশেষে গ্রামের প্রধান সম্মানিত ব্যক্তি বা নকমার বাড়ি উৎসব হয়। এখানে গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি বা প্রধান পুরোহিত খ্রিকা (পবিত্রকরণ অনুষ্ঠান) প্রদর্শন করে। এতে বেত ও বাঁশের তৈরি এক ধরনের ঢাল যা ক্ষি নামে পরিচিত এবং বাঁশের তৈরি যুদ্ধাস্ত্র মিস্ত্রাম ব্যবহার হয়। মূলত যুদ্ধ কৌশলই দেখানো হয়।

গারোদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িই ফুলে ফুলে সাজানো। নানা রকম ফুলে হাসতে থাকে বাড়ির প্রতিটি কোণ, উঠোন। তার মাঝখানে উৎসবে মেতে ওঠে তারা। ঘরের বারান্দায় গ্রামের লোকদের বসার ব্যবস্থা থাকে। তাদের নারী-পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা বসার ব্যবস্থা। আত্মীয়-বন্ধুকে তারা অনেক সময় গান গেয়ে গেয়ে একজন অন্যজনকে চু পান করায়। এতে বন্ধন আরো দৃঢ় হয় বলে অনুমান করা হয়। প্রধানের বাড়িতে উৎসবের মাধ্যমেই রোংচুগালা উৎসব সমাপ্ত হয়।

তুষারের কান

এম আতিকুল ইসলাম

বন্ধুরা, আসছে শুভ বড়োদিন। এদিনে তোমাদের জন্য মজার সব উপহার ভর্তি ঝোলা নিয়ে হাজির হবেন শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বুড়ো, সান্তাক্লজ। লাল-সাদা টুপি আর লম্বা গ্রাউন পরা এ বুড়ো তোমাদের খুব পছন্দ করেন। যিনি তোমাদের এত ভালোবাসেন, তোমরা কি জানো উনার দেশ কোথায়?

সান্তাক্লজের দেশ দুধসাদা বরফে ঢাকা সুদূর উত্তরে, হাজার হ্রদের দেশ ফিনল্যান্ডে। উত্তর মেরুর কাছাকাছি ফিনল্যান্ডের ল্যাপল্যান্ডে শীতকালে মোটামুটি ১৯-২০ ঘণ্টা অন্ধকার থাকে। আবার গ্রীষ্মে ২০ ঘণ্টার বেশি আলো থাকে। টানা ৫৯ দিন রাত থাকে, আবার ৬০ দিন সূর্য অস্ত যায় না। এমনই এক স্থানে ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সান্তাগ্রাম। ল্যাপল্যান্ডে সান্তার গ্রাম করার অন্যতম কারণ হলো, খ্রিষ্টান সম্প্রদায় বিশ্বাস করে, তিনি এসেছেন 'কোর্ভা তুনতরি' থেকে। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'তুষারের কান'। ৪৮৩ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট কান আকৃতির একটি তুষারের পাহাড় আছে। এর মাধ্যমে সান্তা বিশ্বের সব শিশুর আবদার শুনতে পান।

১৯৮৫ সনে সান্তাক্লজের এ গ্রামটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হলে এর পরিচিতি দিন দিন বাড়তে থাকে। গ্রামের কাছেই স্থাপন করা হয় সান্তা পার্ক। কখনো সময় সুযোগ হলে ঘুরে আসতে পারো উনার বাড়ি থেকে। সাদা বরফে ঢাকা গ্রাম ঘুরে দেখার জন্য এখানে আছে শত শত স্লেজ গাড়ি। স্লেজ গাড়ি হচ্ছে হাস্কি জাতীয় কুকুরের টানা এক ধরনের গাড়ি। এ গাড়িতে চড়ে তুষারে ঢাকা গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রাইনডিয়ারদের দুরন্ত ছোটাছুটি পর্যটকদের দারুণ আকর্ষণ করে। রাইনডিয়ার বা বলগা হরিণের বিচরণ তুষারাবৃত শীতপ্রধান এলাকায়। বড়ো আকৃতির এ হরিণটি বড়োদিনের বিশেষ ঐতিহ্য। কারণ সান্তাক্লজের উপহার সামগ্রী টানার কাজটি যে বেচারার কাঁধেই পরে।

বড়োদিন উপলক্ষে প্রতিদিনই ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কি থেকে লাপল্যান্ডে উড়ে আসে একের পর এক ফ্লাইট। এখানের অন্যতম আর্কষণ হলো বরফে নির্মিত হোটেলে রাত্রিযাপন।

মেরু অঞ্চলের এ বরফের ঘরগুলোকে ইগলু বলা হয়। আর খাবারের মেনুতেও আছে সেই রাইনডিয়ার।

এত কিছু যখন হলো আসল কাজটাই যে বাদ পড়ে গেল। ঠিক ধরেছ, সান্তাক্লজের সাথে ছবি তোলা। সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সান্তার সাথে ছবি তোলা যায়। তবে একটু ধৈর্য্য ধরে অনেকক্ষণ লাইনে থাকতে হয়।

বন্ধুরা, সবশেষে তোমাদেরকে চুপি চুপি একটি কথা বলি। কাউকে বলো না যেন। সান্তাক্লজ তোমার ঠিকানাতেও পাঠাবেন শুভেচ্ছা বার্তা। প্রতি বছর তোমার মতো লাখ লাখ শিশু সান্তার কাছে চিঠি পাঠায়। আর উনি সেগুলোর উত্তরও দেন। শুধু এ চিঠি আদান-প্রদান করার জন্যই গ্রামটিতে ঢোকার মুখে একটি ডাকঘর স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং আর দেরি কেন? এখনই চিঠি পাঠাও সান্তার কাছে। আর অপেক্ষা করত থাকো সুদূর উত্তর থেকে আসা উত্তরের জন্য।

নদী
ধারাবাহিক

কর্ণফুলীর দিনরাত্রি

মীম নোশিন নাওয়াল খান

অনেক অনেক দিন আগের কথা। মেঘের উপরে এক পাশে ছিল দৈত্যদের রাজ্য, অন্য পাশে পরির রাজ্য। একবার দৈত্যদের রাজ্যে যুদ্ধ লাগল। সে-কী ভয়ংকর যুদ্ধ! দৈত্যরা এক দল অন্য দলের দিকে ইয়া বড়ো বড়ো ধারালো তীর ছুড়তে লাগল। সেই তীরগুলো ছিল অনেক অনেক বড়ো।

তীর ছোড়াছুড়ির সময় একটা তীর আকাশ থেকে পড়ে গেল। সেই তীরটা সাঁই করে এসে বিঁধে গেল একটা পাহাড়ের গায়ে। সেই পাহাড়টা হচ্ছে ভারতের লুসাই পাহাড়। গায়ে তীর বিঁধে পাহাড়টা খুব ব্যথা পেল। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু ব্যথা তো আর কমে না। তীরটা ফুটেই রইল তার গায়ে।

পাহাড়ের কান্নার শব্দ পেয়ে পরিরাজ্য থেকে একজন পরি জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে লুসাই? তুমি এভাবে কাঁদছ কেন?

লুসাই পাহাড় কাঁদতে কাঁদতে বলল, দেখ, দৈত্যদের ছোড়া তীর আমার গায়ে এসে বিঁধেছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। খুব ব্যথা করছে। তীরটা আমি ছুটাতেও পারছি না।

পরিটার খুব কষ্ট হলো পাহাড়ের জন্য। সে আরো অনেক পরিকে নিয়ে গিয়ে জাদু দিয়ে পাহাড়ের গা থেকে তীরটা ছুটিয়ে দিল। কিন্তু তীর বের করে দেওয়ার পরেও পাহাড়ের গায়ের যন্ত্রণা কমলো না। বরং তার যেখান থেকে তীরটা ছুটানো হয়েছে, সেখানে একটা বিরাট বড়ো ফুটো হয়ে গেল। নিজের এই অবস্থা দেখে পাহাড়টা চিৎকার করে কাঁদতেই লাগল। পরিরা তখন পরিরানিকে গিয়ে বলল পাহাড়ের দুঃখের কথা। রানি বললেন, ঠিক আছে। আমি দেখছি।

পরিরানি পাহাড়কে দেখতে এলেন। পাহাড় বলল, দেখুন রানিমা, আমার গায়ে ফুটো হয়ে গিয়েছে। আমি দেখতে কদাকার হয়ে গিয়েছি।

রানি বললেন, আমি তো ফুটোটা বন্ধ করতে পারব না পাহাড়, তবে আমি তোমাকে অন্যভাবে সাহায্য করতে পারি।

এই বলে রানি পাহাড়ের গায়ের ওই ফুটো থেকে একটা নদী তৈরি করে দিলেন। পাহাড়কে বললেন, দেখো লুসাই! তোমার গা থেকে কী সুন্দর কুলকুল করে একটা নদী বইছে! এখন আর তোমার গায়ের ফুটো দেখা যাবে না। বরং এই নদীটার জন্য তোমাকে আরো অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।

লুসাই পাহাড় তখন কান্না বন্ধ করে শান্ত হয়ে নিজের দিকে তাকালো। নিজেকে দেখে সে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল। আরে! নদীটা এত সুন্দর!

এই নদীটাই হচ্ছে কর্ণফুলী।

তবে তার নাম কিন্তু কর্ণফুলী ছিল না। পরিরানি বা লুসাই পাহাড় নদীটির কোনো নাম দেয়নি। নদীটা মিজোরামের মধ্যদিয়ে

প্রবাহিত হচ্ছিল। মিজোরামের লোকেরা ওর নাম দিয়েছিল খাওৎলাং তুইপুই। তারপর ওর নাম কীভাবে কর্ণফুলী হলো জানো?

একবার আরাকানের এক রাজকন্যা চট্টগ্রামের এক আদিবাসী রাজপুত্রকে ভালোবেসে ফেলে। এক জ্যোছনা রাতে তারা দুজন এই নদীতে নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রাজকন্যার কানে গোঁজা ছিল খুব সুন্দর একটা ফুল। রাজকন্যা যখন মুগ্ধ হয়ে নদীর পানিতে চাঁদের প্রতিফলন দেখছিল, তখন হঠাৎ ফুলটা পানিতে পড়ে যায়। রাজকন্যার খুব মন খারাপ হয়। সে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে পানিতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু প্রবল স্রোত রাজকন্যাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাকে বাঁচাতে রাজপুত্রও পানিতে ঝাঁপ দিয়েছিল, কিন্তু রাজকন্যাকে খুঁজে পায়নি। তাই সে পানিতে আত্মাহুতি দেয়।

এভাবেই তাদের রূপকথার গল্পের করুণ সমাপ্তি হয়। আর তখন থেকেই এই নদীটির নাম হয় কর্ণফুলী।

কর্ণফুলী নদীটি লুসাই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে ভারতের মিজোরাম থেকে চলতে চলতে বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলায় এসে ঢুকল। রাঙামাটির বরকল উপজেলার ঠেগামুখ এলাকা দিয়ে সে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে। কিন্তু সে আসলে বাংলাদেশে যাবে, নাকি ভারতে থাকবে, সেটা সে বুঝে উঠতে পারল না। তাই এখান থেকে বড়ো হরিণার মুখ পর্যন্ত কর্ণফুলী ভারত আর বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে চলতে থাকল। সেজন্য কর্ণফুলীকে বলা হয় আন্তঃসীমান্ত নদী।

কর্ণফুলী নদী রাঙামাটিতে একটা দীর্ঘ শাখা বিস্তৃত করে ধুলিয়াছড়ি এবং কাপ্তাইয়ে আরো দুটো শাখায় বিভক্ত হলো। রাঙামাটি এবং ধুলিয়াছড়ির শাখা দুটো আবার একসাথে হয়ে এখন কাপ্তাই হ্রদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

কিন্তু এটুকু ঘুরে তো কর্ণফুলীর মন ভরল না। তাই সে কাপ্তাই শাখা থেকে বেরিয়ে আরো চলতে লাগল। এবার সে সীতাপাহাড় পর্বতমালার ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। তারপর চন্দ্রঘোনার কাছে পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে বেরিয়ে চট্টগ্রাম জেলার সমতল ভূমিতে এসে নামল।

কর্ণফুলী তার ইচ্ছেমতো চলছিল। কিন্তু তার কাপ্তাইয়ের অংশে বাঁধ দেওয়া হলো। ফলে তার মূল চলার পথটা তাকে পালটে ফেলতে হলো। বাঁধের উত্তর পাশে রইল কাপ্তাই লেক, আর দক্ষিণে মূল কর্ণফুলী নদী।

কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ দেওয়া হয়েছিল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার জন্য। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর ওপর নির্মিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আমাদের দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

কাপ্তাই লেকের অংশ থেকে স্পিলওয়ে দিয়ে পানি ছাড়া হলো। তাই কর্ণফুলী একটু পূর্ব দিকে গিয়ে নতুন চলার পথ তৈরি করে নিল। সেখান থেকে কাপ্তাইয়ের ব্রিকফিল্ডের পাশ দিয়ে সেগুন বাগান হয়ে নতুন বাজার, চিৎমরম, শিলছড়ি, রাম পাহাড়, সীতার পাহাড়, বড়ইছড়ি, ডলুছড়ি, নারাণগিরি ও চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী পেপার মিল পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার গতিপথে ৭ ধাপে আঁকাবাঁকাভাবে কর্ণফুলী তার গতি পরিবর্তন করেছে। বড়ইছড়ি ও নারাণগিরি খালের মুখ থেকে চন্দ্রাকৃতির বাঁক নিয়ে পশ্চিমের ভাটির দিকে সোজাসুজি ৫ কিলোমিটার গিয়ে সে গড়িয়ে পড়ে রাঙ্গুনিয়ার চন্দ্রঘোনা কদমতলীতে।

চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী নদীর তীরে নির্মিত হয় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কাগজের কারখানা কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেড। এটি দেশের সর্ববৃহৎ কাগজ উৎপাদনকারী কারখানা।

এই চন্দ্রঘোনায় এসে কর্ণফুলী নদীর দেখা হলো পাহাড়ের সঙ্গে। পাহাড় আর নদী মিলে অপরূপ সুন্দর দৃশ্য তৈরি করল। নদীটা পাহাড়ের সঙ্গে গল্প করল, হাসল, খেলল। তারপর সে আবার পথ চলতে লাগল। কিন্তু ডান তীরে চন্দ্রঘোনার মধ্যম কদমতলী ও বাম তীরে কোদালা চা বাগানের মাঝখানে এসে জেগে ওঠা বিশাল চর তাকে আটকে দিল। তাকে আবার তার চলার পথ পালটাতে হলো। এদিক-সেদিক দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নদীটা বোয়ালখালীর সীমান্তবর্তী নাজির চরে এসে হাজির হলো। এখান থেকে আবার কর্ণফুলী অনেক এলাকা ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে তার কিছু এলাকার ওপর রাগ হলো। সেই এলাকাগুলোকে সে তখন ভেঙে ডুবিয়ে দিল তার পানিতে। ঐতিহ্যবাহী চৌধুরীর হাটকে এভাবেই কর্ণফুলী টুপ করে ডুবিয়ে দিয়েছে।

কর্ণফুলীর চলার পথে তার সঙ্গে দেখা হলো হালদা

নদীর। হালদার সাথে একটু গল্পগুজব করে সে আবার চলতে লাগল।

কর্ণফুলী অনেক পথ চলেছে, অনেক এলাকা ঘুরেছে। তার বুকের ওপর দিয়ে মানুষ সেতু তৈরি করেছে। এমন একটা সেতু হচ্ছে শাহ আমানত সেতু। শাহ আমানত সেতু পেরিয়ে কর্ণফুলী তৈরি করেছে তার নিজের রাজ্য। তার দুই পাড়ে কত কোলাহল, তার বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে কত বড়ো বড়ো নৌকা-জাহাজ-সাম্পান!

কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ দেওয়া হয়েছিল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার জন্য। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর উপর নির্মিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আমাদের দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

কর্ণফুলী মানুষের দুঃখ দেখেছিল। দেখেছিল কীভাবে ঠাসাঠাসি করে এই দেশে সবাই বসবাস করে। দেখেছিল এখানে ফসলি জমি নিয়ে কত কাড়াকাড়ি। তাই সে চলার পথে কোথাও কোথাও চর জাগিয়ে দিল। সেসব চরে মানুষ আবাস গড়ল, চাষাবাদ করল। এগুলোর মধ্যে আছে চর খিজিরপুর, ইমামল্লার চর, চরলক্ষ্যা, চরপাথরঘাটা, মনোহর খালী, পতেঙ্গা ইত্যাদি।

এমন করে গৌরবের সঙ্গে চলতে চলতে চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৭ কিলোমিটার সম্মুখে কর্ণফুলীর দেখা হলো বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে। কর্ণফুলী তখন লুসাই পাহাড় থেকে ৩২০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এসে খুব ক্লান্ত। সে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে। সমুদ্র তাকে পরম যত্নে নিজের কাছে টেনে নিল। আর সমুদ্রের কোলে অন্য সব নদীদের সঙ্গে আড্ডা-গল্প-গানে কাটতে লাগল কর্ণফুলীর দিনরাত্রি।

শীতে গরম খাবার

শীতকাল সবজির সময়। এ সময় নানারকম সবজি পাওয়া যায়, যা শরীরের জন্য উপকারী। সবজি দিয়ে তৈরি স্যুপ শীতে শরীর গরম রাখে এবং খেতেও দারুণ। বন্ধুরা, তোমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারে এ স্যুপ।

এসো জেনে নেই সবজি স্যুপ তৈরির মজাদার রেসিপি।

(উপকরণ)

২ কাপ টমেটো কুচি, ৪ কাপ পানি, ½ কাপ বাঁধাকপি কুচি ½ কাপ গাজর কুচি, ১টি তেজপাতা, ২টি লং, ১টি দারুচিনি, ১ টেবিল চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার, ৪ টেবিল চামচ বিনস, লবণ (পরিমাণ মতো), ½ কাপ চিজ (সাজানোর জন্য)।

প্রণালি:

১. প্রথমে টমেটোর কুচিকে সিদ্ধ করে নিতে হবে। পানিতে টমেটো কুচি দিয়ে উচ্চতাপে সিদ্ধ করতে হবে। যতক্ষণ না টমেটো নরম হচ্ছে। নরম হয়ে গেলে টমেটোগুলো পানির সাথে ভালো করে মিশিয়ে নাও।

২. একটি প্যানে তেল গরম করতে দাও।

৩. তেল গরম হয়ে আসলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দাও।

৪. পেঁয়াজ নরম হয়ে আসলে এতে দারুচিনি, লং, গোলমরিচ, তেজপাতা দিয়ে দাও।

৫. তারপর এতে বাঁধাকপি কুচি, গাজর কুচি দিয়ে ৩ থেকে ৪ মিনিট ভেজে নাও।

৬. এরপর টমেটো সিদ্ধ পানিটি দিয়ে দাও।

৭. এবার আস্তে আস্তে স্যুপে কর্ন ফ্লাওয়ার দিয়ে দাও।

৮. শেষে বিনসগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না কর।

৯. চুলা থেকে নামিয়ে পনির কুচি দিয়ে পরিবেশন কর। মজাদার ভেজিটেবল স্যুপ হয়ে গেল।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

আমার বাংলাদেশ

আরিফা আক্তার

আমার দেশ বাংলাদেশ
সৌন্দর্যের যার নাই তো শেষ
মাঠে ভরা সোনার ফসল
নদীতে মাছ রুই-কাতল।
সকালবেলা হিমেল হাওয়া
শিশির জলে ভিজে যাওয়া
নদীর বুকে মাঝির গান
কৃষক কাটে ক্ষেতের ধান
এতই সুন্দর পরিবেশ
আমার সোনার বাংলাদেশ।

সপ্তম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আত্মত্যাগ

সুমাইয়া আক্তার

রক্ত দিয়ে শক্ত করে
দাঁড়িয়েছে মোদের দেশ
তাঁদের কথা বলতে গেলে
হবে না কো শেষ।

কত না তারা ভালোবেসেছে
এই দেশের মাটি
তাই তো জীবন দিয়ে
মন করেছে খাঁটি।

অষ্টম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

বিজয়

রাইসা ফারজানা

বিজয় মানে স্বাধীন দেশ
সাজবে নতুন বেশ
বিজয় মানে ভোরের পাখি
সারাদিন ডাকাডাকি
বিজয় মাসে হাসবে চাষি
বাজিবে সুখের বাঁশি
বিজয় মানে স্মৃতির নদী
চলে নিরবধি
ঢেউ তুলে মনে
অশ্রু জমে চোখের কোণে

দশম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল

বিজয়ের এই ছবিটি এঁকেছে মীর্জা মাহের আসেফ। এই বন্ধুটি পড়ে ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে

বেগম রোকেয়া ও সুলতানার স্বপ্ন

বেগম রোকেয়া উনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতিমান বাঙালি সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি ১৮৮০ সালে ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মলগ্নে মুসলমান সমাজ ছিল নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। নারী শিক্ষার সুযোগ বলতে ছিল শুধু কোরান শিক্ষা ও উর্দু শিক্ষা। বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাবের গোপনে ঘরেই বাংলা ও ইংরেজি শেখাতেন বেগম রোকেয়াকে। বিয়ের পর স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের কাছে বাংলা ও ইংরেজি উত্তমরূপে আয়ত্ব করেন। তাঁরই উৎসাহে শুরু করেন সাহিত্যচর্চা। তখন থেকেই একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ জমা শুরু করেন। ১৯০৯ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

বেগম রোকেয়ার উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে একটি Sultana's Dream, যার অনূদিত রূপের নাম সুলতানার স্বপ্ন। এটিকে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যে একটি মাইলফলক ধরা হয়। তার অন্যান্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, মতিচুর ইত্যাদি। তাঁর প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজন আর লিঙ্গসমতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, ধর্মের নামে নারীর প্রতি অবিচার রোধ করতে চেয়েছেন।

বেগম রোকেয়া বুঝেছিলেন, সমাজে নারীর উন্নয়নের জন্য প্রথমে দরকার কন্যাশিশুদের উন্নয়ন। অসচেতন নারী সমাজকে সচেতন করার জন্য তিনি আহ্বান করেছেন, 'ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন, অগ্রসর হউন! মাথা ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! আমরা জড়োয়া অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্ধুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বলো! আমরা মানুষ।'

তিনি আরো বলেন, 'পুরুষদের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যরিষ্টার, লেডী জজ, সবই হইব [রোকেয়া রচনাবলি, পৃ. ২৯-৩০]

সুলতানার স্বপ্ন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের এক অনন্য সৃষ্টি। তিনি এটি ইংরেজিতে Sultana's Dream শিরোনামে লিখেছিলেন। এটি ১৯০৫ সালে মাদ্রাজের The Indian Ladies Magazine-এ প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। পরে ১৯০৮ সালে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়।

সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থে বেগম রোকেয়া একটি নারীবাদী স্বপ্নরাজ্য বা ইউটোপিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে নারী ও পুরুষের প্রচলিত ভূমিকা উলটে গেছে। সে সমাজে নারীরা সামাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান চালিকাশক্তি আর পুরুষরা প্রায় গৃহবন্দি। সে সমাজে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় না। সেখানে সবার মধ্যে প্রচলিত ধর্মই হচ্ছে ভালোবাসা ও সত্যের। দৈহিক শক্তি দিয়ে দেশকে বাঁচাতে না পারলে মস্তিষ্ক দিয়ে চেষ্টা করে সে সমাজের মানুষেরা।

বেগম রোকেয়া শত বছর আগে সুলতানার স্বপ্ন -এর মাধ্যমে নারীর অগ্রযাত্রার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এখন অনেকটাই বাস্তবে রূপ পেয়েছে। দেশের নারীরা এখন কেরানি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী- সবই হচ্ছেন। সে অর্থে বেগম রোকেয়া যে নারী জাগরণের সূচনা করেছিলেন তা এখন দ্রুতগতিতে না হলেও ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগুচ্ছে। এটাই বেগম রোকেয়ার সফলতা।

কারাতে আগামীর তারকা

নবারুণের বন্ধুরা, তোমাদের আজ ছোট্ট এক সাহসী চ্যাম্পিয়নের কথা শোনাব। যার বয়স মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর। যে বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত প্রথম ফেডারেশন কাপ কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে মোট ৩টি পদক পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কারাতে ভুবনের সেই সাহসী আগামী তারকার নাম মায়মুনা।

মায়মুনা ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত বিজয় দিবস কারাতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে মাত্র তিন বছর বয়সেই গলায় পরে নেয় একটি ব্রোঞ্জ মেডেল। এরপর ২০১৭ স্বাধীনতা দিবস কারাতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েও জিতে নেয় একটি ব্রোঞ্জ পদক। আর প্রথম ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ কাতায় রৌপ্য পদক ও কুমিতে ও একক কাতায় দুটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। মায়মুনা কারাতে জগতের খুব পরিচিত একটি নাম মো. আব্দুল গফুর আলী সিকদারের মেয়ে।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ

পথশিশুদের স্বপ্নপূরণ

আমাদের সমাজে এক শ্রেণির মানুষ রয়েছে যারা অসহায়। যারা বেড়ে ওঠে অযত্ন অবহেলায় আর অনাদরে। খোলা আকাশের নিচে যাদের বসবাস। অথচ যাদের কোনো সমাজ নেই, বসবাসের জন্য ঘর নেই। এতক্ষণ যাদের কথা বললাম, নিশ্চয়ই বুঝছ এরা কারা। এরা হচ্ছে পথশিশু। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এরকম কিছু পথশিশু রয়েছে। এদের কেউ বিকেল বেলা ফ্লাস্কে করে চা, কেউ ঝুড়িতে করে বাদাম বুট, কেউ আবার ফুল বিক্রি করে। এটা ওদের পেশা নয়। কিন্তু এ কাজগুলো তারা করছে জীবিকার প্রয়োজনে।

ওরাও মানুষ ওদেরও সমাজে ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তরুণ-তরুণীর উদ্যোগে: গ্রিন সার্ভাইভ অব বাংলাদেশ' নামক একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। ম্যানেজমেন্ট স্টাডি বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাহিদুল করিমের উদ্যোগে ২০১৬ সালে এই সংগঠনের পথচলা শুরু। দুপুর ১২টা থেকে সদস্যরা পথশিশুদের পাঠদান করান সপ্তাহে পাঁচদিন। রোদ-বৃষ্টিতে যাতে পাঠদানে বাধা না ঘটে সেজন্যে একটি বাসা ভাড়া নেওয়া হয়েছে। পাঠদানের ফাঁকে শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার দেওয়া হয়। শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বই, খাতা, কলম, পেন্সিলও দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে সংগ্রহ করে দেওয়া হয় জামাকাপড়ও।

পড়াশুনার পাশাপাশি সেখানে খেলাধুলারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে পথশিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি আচার-আচারণ এবং নৈতিকতাও শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমে শিক্ষার্থী কম ছিল কিন্তু বর্তমানে নানা সুবিধা পাওয়ায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। সংগঠনটির কার্যক্রম চালানোর জন্য সদস্যরা নিজেদের থেকে চাঁদা ও শিক্ষকদের থেকে অনুদান সংগ্রহ করে থাকেন। এভাবে সরকারের

পাশাপাশি সমাজের সচেতন ও বিত্তবান মানুষরা এগিয়ে আসলে সমাজে পথশিশু বলে কিছু থাকবে না।

শিক্ষার জন্যে অদম্য চেষ্টা

পিউ দাস। যার বয়স ১৭, উচ্চতা মাত্র ২ ফুট ওজন ২০ কেজি। চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার উত্তর কলা উজান রামদয়াল তহসিলদার পাড়ার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী। হতে পারে সে শারীরিক প্রতিবন্ধী। কিন্তু মনটা তো আর দশটা স্বাভাবিক মানুষের মতো। মেয়ের অদৃশ্য আগ্রহ আর মায়ের চেষ্টার ফলে আজ সে লোহাগাড়ার সুখছড়ি উচ্চ বিদ্যায়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। পিউ হাঁটিতে শেখার পর থেকেই হাঁটিতে গেলে পায়ের হাড় ভেঙে যেত। অসচ্ছল পরিবার নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী চিকিৎসা করিয়েছেন, কিন্তু ভালো হয়নি। তারপরও তার বাবা-মা পিউকে ঘরে বসিয়ে রাখেননি। গত দশ বছর ধরে মা কৃষ্ণা দাস মেয়েকে কোলে করে হেঁটে দেড় কি.মি. দূরে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন। কারণ প্রতিবন্ধী হিসেবে সমাজের বোঝা হয়ে না থেকে যাতে লেখাপড়া শিখে অন্তত নিজে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

আফরিন হোসেন অরন্যা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূরমোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, পিলখানা, ঢাকা

আমের দেশে বইমেলা

বন্ধুরা, আমের দেশ রাজশাহী ঘুরে এল নবারুণ। ২৩-৩০ অক্টোবর ২০১৭ রাজশাহী কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী বইমেলা। এবারের প্রতিপাদ্য 'চেতনার জাগরণে বই'। এ মেলায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) অংশগ্রহণ করে। মেলার আয়োজন করে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং রাজশাহী জেলা প্রশাসন। মেলার উদ্‌বোধন করেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার নূর-উর-রহমান।

এ বইমেলা বইপ্রেমীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। মেলায় বড়োদের পাশাপাশি দেখা যায় শিশু-কিশোরদেরও। কেউ বাবার হাত ধরে, কেউ মায়ের সাথে আবার কেউ স্কুলের সহপাঠীদের সাথেও মেলায় আগমন করে। মেলায় ডিএফপি থেকে প্রকাশিত সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও বিভিন্ন অ্যাডহক প্রকাশনা প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ও এসডিজির ৬০০ (ছয়শত) কপি পুস্তিকা সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও সাধারণ জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়।

বইমেলায় আগত দর্শনার্থীগনের নবারুণ ও সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকার প্রতি ছিল আলাদা আগ্রহ। আকর্ষণীয় অথচ অনেক কমমূল্যে এসব গ্রন্থ তারা নিয়মিত পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নবারুণ-এর বিশেষ সংখ্যা যেমন-ভূত, বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ, রোবট, গাড়ি ইত্যাদি সংখ্যাসমূহ শিশু ও কিশোরদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগায়। শিশু-কিশোররাও অনেক উৎসাহ নিয়ে বইগুলো দেখে ও কিনে। আবার এই প্রিয় বইটি যাতে রাজশাহীতে বসে পাওয়া যায় সেজন্য অনেকে হয়েছে গ্রাহকও। গ্রন্থ বিক্রয়ের

সংখ্যার দিক থেকে এ অধিদপ্তরের অবস্থান ছিল সামনের দিকে। প্রতিদিন গড়ে ৩০-৩৫ জন দর্শনার্থী ডিএফপি স্টলে আসে। রাজশাহী বইমেলার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন উপপরিচালক (প্রকাশনা) হাছিনা আক্তার।

প্রতিবেদন : মো. আব্দুছ ছালেক বসুনীয়া

মরিয়াম চৌধুরী অয়িতা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, রাজবাড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

মুশফিকুর রহমান আবিদ, ২য় শ্রেণি, এল এম জি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল

অয়ালিদ হাসান, ৯ম শ্রেণি, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া

স্পর্শ ডি কস্তা, ৪র্থ শ্রেণি, বনানী বিদ্যা নিকেতন

মো. তাহমিদুল হক তাসিন, ৫ম শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

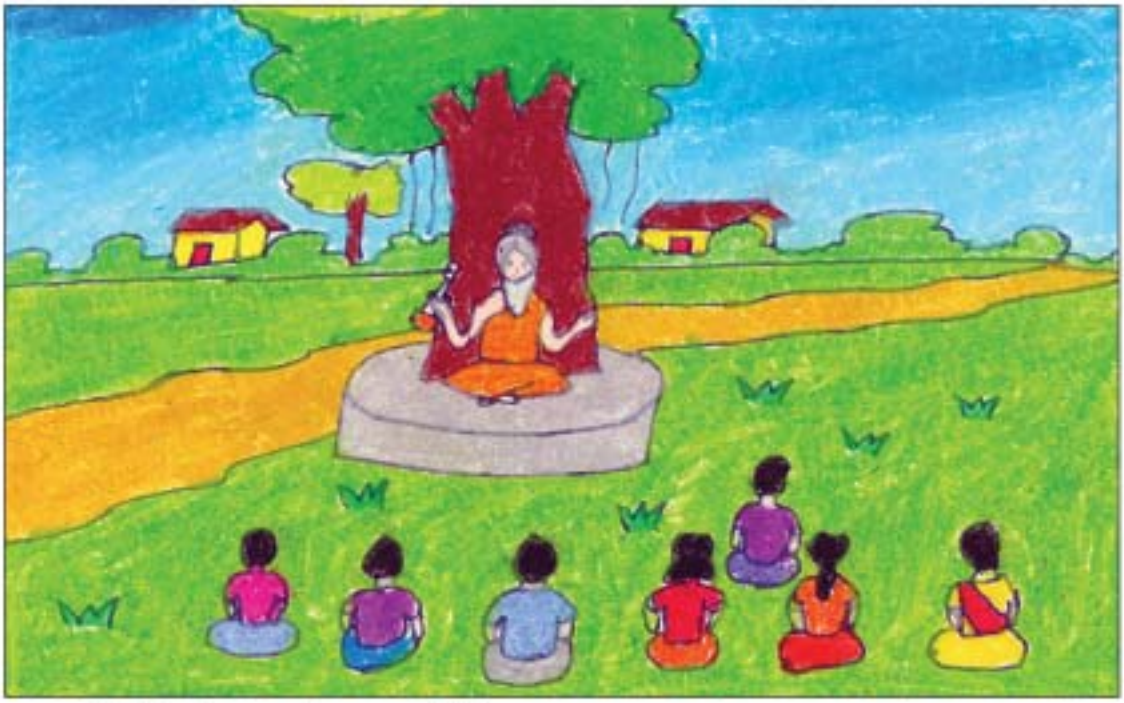

শেখ তাওসীফ বিন হাবিব, ৭ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

উদ্যোগ ৪

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

শিক্ষিত জাতি সমৃদ্ধ দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

বন্ধুরা, তোমরাতো জানো শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। যে দেশে শিক্ষিতের হার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, তাও তোমরা জানো। বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি'। এই কর্মসূচির স্লোগান হচ্ছে- 'শিক্ষিত জাতি সমৃদ্ধ দেশ/ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ।'

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে - তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। বন্ধুরা, আগে স্কুলে যেতে হলে বই কিনতে হতো নিজেদের এবং বেতনও দিতে হতো। এজন্য শিক্ষার্থীর হার কম ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমানো এবং শতভাগ শিশুকে স্কুলগামী করতে দুপুরে বিদ্যালয়ে খাবারের ব্যবস্থা করেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবতেদায়ী, দাখিল ও এসএসসি পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ, বিনা বেতনে অধ্যায়নের সুযোগ এবং শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি প্রদান, শ্রেণিকক্ষসমূহে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করেছে। এরফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হচ্ছে। আর এর সুফল ভোগ করছ তোমরা।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে সাফল্য অর্জিত হচ্ছে তা জেনে তোমরা খুশি হবে বন্ধুরা। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০১৭ সারে ৪.২৭ কোটি শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে ৩৬ কোটি ২২ লক্ষ বই বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাথমিক স্তরের ১ কোটি ৭ লক্ষ শিক্ষার্থীর মাঝে প্রথম কিস্তিতে ২৮৭ কোটি টাকার উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পঞ্চম শ্রেণিতে সাধারণ টেলেন্টপুলে মোট ৮২,৪৫৪ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২৬,১৯৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে। সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩,১৭২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, ৫,৫৪৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ এবং পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন ভার্সন তৈরি করা হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্রেইল পদ্ধতির বই বিতরণ করা হচ্ছে। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭ লক্ষ্য শিক্ষককে কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮টি সরকারি এবং ৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার ১,১৬,৮৩৬ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

বন্ধুরা এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জেনে আরো আনন্দিত হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীতকরণ এবং গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করণ করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধ, পুষ্টি সহায়তা ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা। যে সকল উপজেলায় স্কুল ও কলেজ নেই সে সকল উপজেলায় ১টি স্কুল ১টি কলেজ জাতীয়-করণ করা। অটিস্টিক ও স্নায়ু বিকাশজনিত শিশুদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিকমানের 'ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডায়াবিলিটিজ' প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

Regd, Dha, 143-Monthly Nabarun, Vol-42, No- 6, December 2017, Tk-20.00

তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ

'শীত এসেছে লাগল কাঁপন, লাগল দোলা প্রাণে
শীত এসেছে হিমেল হাওয়া, আনন্দ আর গানে... ।'

বন্ধুরা, শীতের আগমনি বার্তা নিয়ে এসে গেল পৌষ। বাংলা সনের নবম মাস। ঋতুচক্রের এ মাসেই শীতের দেখা মেলে। খাওয়া হয় খেজুরের রস, ধোঁয়া ওঠা ভাঁপা, চিতই সহ হরেকরকম পিঠাপুলি। এছাড়াও পাওয়া যায় নানা রকম সবজি। শীতের এমন আমেজে এসো জেনে নেই সবজি নিয়ে বাংলাদেশের আরেকটি সাফল্যের কথা।

বন্ধুরা, আলু আমাদের খুব প্রিয় একটি সবজি। প্রতিদিনের রান্নায় আলু ছাড়া আমাদের যেন চলেই না। এই আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ করেছে বিস্ময়কর সাফল্য। বিশ্বের আলু উৎপাদনকারী শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম। এমন স্বীকৃতিটি দিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)। বর্তমানে বাংলাদেশে আলুর উৎপাদন ৮২ লাখ ১০ হাজার টন।

তোমরা কি জানো বন্ধুরা, আলুতে আছে কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ শর্করা। আছে ভিটামিন সি, পটাসিয়াম, ম্যাংগানিজ, ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

বন্ধুরা, শুধু তরকারি নয় আলু দিয়ে তৈরি হয় মজার মজার খাবারও। বিশেষ করে আলু ভর্তা বাংলার ঘরে ঘরে এক মুখরোচক খাবার। এছাড়াও খেতে পারো আলুর চিপস, ফেঞ্চ ফ্রাই, আলুর চপ, রসে ভরা আলু পিঠা সহ আরো কত কি!

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফফাত আঁখি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা